পথের
সম্বল
আব্দুল হামীদ ফাইযী

উপস্থাপনা

(হযরত শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আল-জিবরীন)

আলহামদু লিল্লা-হি রাব্বিল আ-লামীন, অসসালা-তু অসসালা-মু আলা মুহাম্মাদিউ অ আ-লিহী অসাহবিহ, অ বা'দঃ-

পথ ও সফরের সম্বলস্বরূপ বিভিন্ন উপদেশ ও নির্দেশবাণী সম্বলিত অত্র পুস্তিকা খানি আদ্য-প্রান্ত পাঠ করলাম। সত্যই তা নিজ বিষয়াবলীতে সমৃদ্ধ ও সুন্দর। তওহীদ, নামায, সদাচারণ, সচ্চরিত্রতা শিক্ষায় এবং পাপ-পঙ্কিলতা ও ঘৃণ্য আচরণ থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে এখেকে সকলেই উপকৃত হবে।

পুস্তিকাটিকে সুন্দর রূপদান করতে সেই সমস্ত ওলামাগণের রচনাবলী সংকলিত হয়েছে যাঁরা শরীয়তের স্পষ্ট উক্তির অনুগামী এবং যাঁদের মত ও পথ দলীল দ্বারা বলিষ্ঠ। এতে সেই সকল বিষয়াবলী স্থান পেয়েছে যা বর্তমান যুগে নিতান্ত জরুরী ও প্রয়োজনীয়। আল্লাহ এর সংকলককে উত্তম প্রতিদান দান করুন। এর দ্বারা সকল মুসলমানকে উপকৃত করুন। আল্লাহই সরল ও সঠিক পথের দিশারী। *অ সাল্লাল্লাহু অসাল্লামা আলা মুহাম্মাদিউ অ আ-লিহী অ সাহবিহী অ সাল্লাম।*

১১/১/১৪১৫ হিঃ

আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাহমান আল জিবরীন।

ভূমিকা

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি। তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁর নিকটেই ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং আমাদের আত্মার মন্দ ও নোংরা আমল হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে পথনির্দেশ করেন তাকে ভ্রষ্ট করার কেউ নেই এবং তিনি যাকে ভ্রষ্ট করেন তাকে পথনির্দেশকারী কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। যিনি বলেন,

﴿أُدْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ...﴾

তুমি তোমার প্রতিপালকের পথে (মানুষকে) প্রজ্ঞা ও সদুপদেশের সহিত আহ্বান কর। *(সুরা নাহল ১২৫)*

আর আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর দাস ও (প্রেরিত) রসূল। যিনি বলেন, "তোমরা আমার নিকট হতে পৌঁছে দাও; যদিও একটি আয়াত হয়।" আল্লাহ তাঁর উপর, তাঁর বংশধর ও সাহাবাগণের উপর এবং কিয়ামত অবধি তাঁর পথে চলমান ব্যক্তিবর্গের উপর রহমত এবং অধিক অধিক শান্তি বর্ষণ করুন।

আল-মাজমাআয় অবস্থানরত প্রবাসীদেরকে দাওয়াত ও পথনির্দেশের জন্য সমবায় কার্যালয় পাঠকের খিদমতে এই পুস্তিকা খানি পেশ করতে পেরে আনন্দ বোধ করছে। যে পুস্তিকায় রয়েছে, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর কয়েক গুচ্ছ ফতোয়া এবং প্রবন্ধ। যা মহামান্য ওলামা শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, শায়খ মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উসাইমীন এবং শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আল-জিবরীন কর্তৃক লিখিত ও পরিবেশিত হয়েছে। আল্লাহ তাঁদের হিফাযত করুন।

আমরা মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি তাঁদেরকে বৃহৎ প্রতিদান প্রদান করুন যাঁরা এই পুস্তিকাটি প্রস্তুত করতে, অনুবাদ করতে, ছাপতে ও মুসলিমদের মাঝে প্রচার করতে অংশ গ্রহণ করেছেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর বংশধর ও সাহাবাগণের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন। *অস্‌সালামু আলাইকুম অরাহমাতুল্লাহ।*

প্রাত্যহিক দুআ ও যিক্‌র

আল্লাহ তাআলা বলেন,

(فَاذْكُرُوْنِيْ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلاَ تَكْفُرُوْنِ)

অর্থাৎ, "সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে স্মরণ কবর, আমার কৃতজ্ঞতা কর এবং আমার কৃতঘ্নতা করো না।" *(সূরাহ বাক্বারাহ ১৫২ আয়াত)*

আমার মুসলিম ভাই!

জেনে রাখুন যে,-আল্লাহ আমাদেরকে ও আপনাকে তাঁর হেদায়াতের প্রতি তওফীক দিন।-নিশ্চয় আল্লাহ জাল্লা শানুহুর যিক্‌র (স্মরণ) শ্রেষ্ঠ আমল। আরো জেনে রাখুন যে, তাঁর মর্যাদা ও মাহাত্ম্যও বিরাট। অনর্থক ও উপকারহীন কথায় নিবিষ্ট হওয়ার চেয়ে আল্লাহর যিকরে ব্যাপৃত হওয়া ইহ-পরকালের জন্য বহু বহু উত্তম।

যিকরের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বহু আয়াত রয়েছে যার কিছু আমরা উল্লেখ করছি; আল্লাহ তা'আলা বলেন,

(يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اذْكُرُوْا اللهَ ذِكْراً كَثِيْراً وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً)

অর্থাৎ-"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক অধিক স্মরণ কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা কর।" *(সূরা আহযাব ৪১-৪২ আয়াত)*

তিনি বলেন,

(الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ)

অর্থাৎ, “যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়, জেনে রাখ-আল্লাহর স্মরণেই (যিক্‌রেই) চিত্ত প্রশান্ত হয়।” *(সূরা রা’দ ২৮ আয়াত)*

যিক্‌র প্রসঙ্গে বহু হাদীসও এসেছে। যার কিছু নিম্নরূপ ঃ-

আবু হুরাইরা ﷺ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আমার প্রতি আমার বান্দার ধারণার কাছে (অর্থাৎ সে আমার প্রতি যে ধারণা রাখে আমি তার জন্য তাই বাস্তবায়ন করে থাকি, ক্ষমার ধারণা ও আশা করলে ক্ষমা পায়) আমি তার সঙ্গে হই, যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, তাহলে আমি তাকে আমার মনে স্মরণ করি। যদি সে আমাকে কোন সমাবেশে স্মরণ করে, তাহলে আমি তাকে তাদের চেয়ে উত্তম সমাবেশে স্মরণ করি। যদি সে আমার প্রতি এক বিঘত পরিমাণ নিকটবর্তী হয়, তাহলে আমি তার প্রতি এক হাত পরিমাণ নিকটবর্তী হই। যদি সে আমার প্রতি এক হাত পরিমাণ নিকটবর্তী হয় তাহলে আমি তার প্রতি উভয়হস্ত-বিস্তৃত পরিমাণ নিকটবর্তী হই। সে যদি আমার প্রতি হেঁটে আসে, আমি তার প্রতি দৌড়ে যাই।” *(বুখারী ৭৪০৫নং ও মুসলিম ২৬৭৫নং)*

আবু মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর যিক্‌র (স্মরণ) করে এবং যে ব্যক্তি তাঁর যিক্‌র (স্মরণ) করে না উভয়ের উপমা জীবিত ও মৃতের ন্যায়।” *(বুখারী ৬৪০৭নং)*

যিকরের কিছু আদব

যিক্‌রকারীর জন্য তার অন্তরকে যিক্‌রে উপস্থিত রাখা আবশ্যক। যেহেতু অন্তর যদি উদাসীন থাকে তাহলে কেবলমাত্র মুখে যিকর করা যথেষ্ট নয়। যে বাক্য দ্বারা যিক্‌র করছে তার প্রতি মনোযোগ দেওয়া এবং তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করাও উচিত। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

(وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ)

অর্থাৎ, "তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয় ও সশঙ্কচিত্তে অনুচ্চস্বরে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ কর এবং উদাসীনদের পর্যায়ভুক্ত হয়ো না।" *(সূরা আ'রাফ ২০৫ আয়াত)*

আমার মুসলিম ভাই! এক্ষণে আপনার সামনে সেই সমস্ত যিকর পেশ করছি যা প্রত্যহ নিদ্রা হতে জাগা থেকে পুনরায় নিদ্রা যাওয়া পর্যন্ত পাঠ করা উত্তম ঃ-

ঘুম থেকে জাগার সময় যা বলতে হয়

اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النُّشُوْر

আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আহয়্যা-না বা'দা মা আমা-তানা অ ইলাইহিন নুশূর।

অর্থ ঃ- সেই আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা যিনি আমাদেরকে মারার পর জীবিত করলেন এবং তাঁরই দিকে পুনরুত্থান। *(বুখারী ৬৩১২নং ও মুসলিম ২৭১১নং)*

আযানের সময় ও তার শেষে যা বলতে হয়

আযান শুনলে মুআয্যিন যা বলে তাই বলতে হয়। *(বুখারী ৬১১নং ও মুসলিম ৩৮৪নং)* অবশ্য "হাইয়্যা আলাস স্বালা-হ" ও "হাইয়্যা আলাল ফালা-হ" শুনে ঃ

لاَ حَوْلَ وَلاَقُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

"লা হাউলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ" বলতে হয়। *(মুসলিম ৩৮৫নং)*

আযান শেষ হলে নবীর উপর দরূদ পাঠ করতে হয়। *(মুসলিম ৩৮৪নং)*

অতঃপর নিম্নের দুআ পাঠ করতে হয়,

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّداً الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوْداً الَّذِيْ وَعَدْتَهُ

"আল্লাহুম্মা রাব্বা হা-যিহিদ্ দা'ওয়াতিত্ তা-ম্মাহ, অস্সালা-তিল ক্বা-ইমাহ, আ-তি মুহাম্মাদানিল অসীলাতা অলফাযীলাহ, অব্আস্হু মাক্বা-মাম মাহমূদানিল্লাযী ওয়াত্তাহ।"

অর্থ ঃ- হে আল্লাহ! হে এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠালাভকারী নামাযের প্রভু! তুমি মুহাম্মাদ ﷺকে অসীলাহ (জান্নাতের এক সুউচ্চ স্থান) ও মর্যাদা দান কর এবং তাঁকে তুমি সেই প্রশংসিত স্থানে পৌঁছাও, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দান করেছ। *(বুখারী ৬১৪নং)*

প্রস্রাবখানা ও পায়খানায় প্রবেশের পূর্বে ও বের হয়ে দুআ

প্রবেশ করার পূর্বে বলবে,

بِسْمِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

বিসমিল্লাহ। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল খুবুসি অল খাবা-ইস।

অর্থ ঃ- আল্লাহর নাম নিয়ে প্রবেশ করছি। *(ইবনে মাজাহ ২৯৭নং,তিরমিযী ৬০৬ নং ,আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।)* হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট খবীস জিন ও জিন্নী হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(বুখারী ১৪২ নং)*

বের হওয়ার পর বলবে, غُفْرَانَكَ "গুফরা-নাক।" (অর্থাৎ, তোমার ক্ষমা চাই)। *(আহমাদ ৬/ ১৫৫, আবু দাউদ ৩০নং, তিরমিযী ৭নং, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।)*

ওযুর শুরু এবং শেষে পঠনীয় দুয়া

ওযুর পূর্বে “বিসমিল্লাহ” (অর্থাৎ আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি) বলতে হয়। *(আবু দাউদ ১১১নং,তিরমিযী ২৫নং,আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।)* (পূর্ণভাবে বিসমিল্লা-হির রাহমা-নির রাহীম বলা বিধিসম্মত নয়।) ওযুর শেষে বলতে হয়,

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَـهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُـهُ، اَلـلَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الـتَّوَّابِيْنَ، وَاجْعَلْنِيْ مِنَ االْمُتَطَهِّرِيْنَ.

আশ্‌হাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহু অ আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসূলুহ। আল্লা-হুম্মাজ্‌আলনী মিনাত্‌ তাউওয়া-বীনা অজ্‌আলনী মিনাল মুতাত্বাহ্‌হিরী-ন।”

অর্থ ঃ- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন সমকক্ষ নেই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা এবং রসূল। *(মুসলিম ২৩৪নং)*

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তওবাকারী এবং পবিত্র অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর। *(তিরমিযী ৫৫নং, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।)*

বাড়ি থেকে বের হতে ও বাড়ি প্রবেশ করতে

বাড়ি থেকে বের হবার সময় বলতে হয়,

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ.

বিসমিল্লা-হি তাওক্কালতু আলাল্লা-হ, অলা হাওলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা আন আযিল্লা আউ উযাল্লা আউ আযিল্লা আউ উযাল্লা আউ আযলিমা আউ উযলামা আউ আজহালা আউ য়্যুজহালা আলাইয়্যা।”

অর্থ ঃ- আমি আল্লাহর নাম নিয়ে বের হচ্ছি। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করছি। আল্লাহর তওফীক ছাড়া পাপ থেকে ফিরার এবং সৎকাজ করার সাধ্য নেই।

হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি- আমি ভ্রষ্ট হই বা আমাকে ভ্রষ্ট করা হয়, আমার পদস্খলন হয় অথবা আমার পদস্খলন করানো হয়, আমি অত্যাচার করি বা অত্যাচারিত হই, আমি মূর্খামি (মূর্খের ন্যায় অসঙ্গত আচরণ) করি বা আমার প্রতি মূর্খামি করা হয়- এসব থেকে। *(আবু দাউদ ৫০৯৪ নং,তিরমিযী ৩৪২৭ নং,নাসাঈ ৫৫০১ নং, ইবনে মাজাহ ৩৮৮৪ নং, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)*

প্রবেশ করার সময় এই দুআ পড়তে হয়;

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ، بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا، وبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا.

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাইরাল মাউলাজে অ খাইরাল মাখরাজি বিসমিল্লা-হি অলাজনা অবিসমিল্লা-হি খারাজনা অ আলা রাব্বিনা তাওয়াক্কালনা।"

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট শুভ প্রবেশস্থল এবং শুভ নির্গমস্থল প্রার্থনা করছি। আল্লাহর নাম নিয়ে আমরা প্রবেশ করলাম এবং আল্লাহর নাম নিয়ে বের হয়েছি এবং আমরা আমাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করলাম।" *(আবু দাউদ ৫০৯৬নং, আলবানী হাদীসটিকে যয়ীফ বলেছেন।)*

মসজিদ প্রবেশ ও নির্গম কালে

মসজিদ প্রবেশ করার সময় নবী ﷺ-এর উপর দরূদ ও সালাম পাঠ করে

بِسمِ اللهِ، والصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلى رَسُوْلِ اللهِ

বিসমিল্লা-হ, অস্‌সালা-তু অস্‌সালা-মু আলা রাসূলিল্লা-হ" বলবে।) *(আবু দাউদ ৪৬৫নং, নাসাঈ ৫০নং, ইবনে মাজাহ ৭৭১নং আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।)*

অতঃপর এই দুআ বলবে, اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

"আল্লাহুম্মাফ তাহলী আবওয়া-বা রাহমাতিক।"

অর্থ ঃ- হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার করুণার দরজা খুলে দাও। *(মুসলিম ৭১৩নং)*

বের হবার সময় বলবে, اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা মিন ফাযলিক।"

অর্থ ঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। *(মুসলিম ৭১৩নং)*

খাওয়ার আগে ও পরে যা বলতে হয়

খাওয়ার শুরুতে "বিসমিল্লাহ" বলতে হয়। *(বুখারী ৫৩৭৬নংও মুসলিম ২০২২নং)*

খাওয়ার শেষে বলতে হয়, – اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ "আলহামদু লিল্লাহ।" *(মুসলিম ২৭৩৪নং)*

অথবা নিম্নের দুআ পড়তে হয়,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْداً كَثِيْراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيْهِ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ، وَلاَ مُوَدَّعٍ،
وَلاَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا

"আলহামদু লিল্লা-হি হামদান কাসীরান ত্বাইয়িবাম মুবা-রাকান ফীহি গাইরা মাকফিইয়্যিন অলা মুওয়াদ্দাইন অলা মুস্তাগ্নান আনহু রাব্বানা।"

অর্থ ঃ- আল্লাহর জন্য অগণিত, পবিত্র ও বর্কতপূর্ণ প্রশংসা। অকুণ্ঠ, নিরবচ্ছিন্ন প্রয়োজন সাপেক্ষ প্রশংসা, হে আমাদের প্রভু! *(বুখারী ৫৪৫৮-নং)*

নতুন কাপড় পরতে ও কাপড় খুলতে

নতুন কাপড় পরার সময় কাপড়ের নাম নিয়ে বলবে,

اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ، وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهِ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ.

"আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু আনতা কাসাউতানীহ, আস আলুকা খাইরাহু অ খাইরা মা সুনিআ লাহ, অ আউযু বিকা মিন শার্রিহী অ শার্রি মা সুনিআ লাহ।"

অর্থ ঃ- হে আল্লাহ! তোমার নিমিত্তেই যাবতীয় প্রশংসা। তুমি এটা আমাকে পরালে। আমি তোমার নিকট এর মঙ্গল এবং যার জন্য এ প্রস্তুত করা হয়েছে তার মঙ্গল প্রার্থনা করছি। আর তোমার নিকট এর অমঙ্গল এবং যার জন্য এ প্রস্তুত করা হয়েছে তার অমঙ্গল হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(আবু দাউদ ৪০২০নং, নাসাঈ ৩১১নং,তিরমিযী ১৭৬৭নং, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।)*

আর কাপড় খোলার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলতে হয়। *(ইবনুস সুন্নী আ'মালুল য়্যাউমি অল লাইলা'তে এবং ত্বাবারানী 'আওসাত্বে' হাদীসটিকে উল্লেখ করেছেন। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। সহীহুল জামে' ৩৬১০নং, ইরওয়াউল গালীল ৫০ নং)*

যানবাহন চড়ার সময়

"বিসমিল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ।" (এর পর নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করবে),

(سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَلَنَا هَذَا، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ)

অর্থ ঃ- আল্লাহর নাম নিয়ে চড়ছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। পবিত্র মহান তিনি যিনি আমাদের জন্য একে বশীভূত করে দিয়েছেন, অথচ আমরা একে

বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আমরা আমাদের প্রতিপালকের দিকে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব।

অতঃপর পড়বে ;"আলহামদু লিল্লা-হ।" - তিনবার।

"আল্লাহু আকবার।" - তিনবার।

এবং এর পর পড়বে ,

سُبْحَانَكَ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ، فَاغْفِرْلِي إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ.

"সুবহা-নাকা ইন্নী যালামতু নাফসী ফাগফিরলী, ইন্নাহু লা য়্যাগ্‌ফিরুয্‌ যুনূবা ইল্লা আন্ত্।"

অর্থঃ- তুমি পবিত্র। নিশ্চয় আমি নিজের উপর অত্যাচার করেছি। সুতরাং তুমি আমাকে মার্জনা করে দাও। যেহেতু গোনাহসমূহকে তুমি ছাড়া কেউ ক্ষমা করতে পারে না। *(আবু দাউদ২৬০২, তিরমিযী ৩৪৪৬ ও নাসাঈ ৫০৬, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।)*

বাজারে প্রবেশকালে

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِ وَيُمِيْتُ، وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوْتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

"লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু অলাহু হামদু য়্যুহয়ী অ য়্যুমীতু অহুয়া হাইয়্যুল লা য়্যামূতু বি য়্যাদিহিল খাইরু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর।"

অর্থ ঃ- আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশী নেই। তাঁরই জন্য সারা রাজত্ব এবং তাঁরই নিমিত্তে সকল প্রশংসা। তিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যু দান করেন। তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই। তাঁর

হাতেই সকল মঙ্গল এবং তিনি সর্ববস্তুর উপর সর্বশক্তিমান। *(তিরমিযী ৩৪২৮নং, ইবনে মাজাহ ২২৩৫নং, আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।)*

মজলিস থেকে উঠার সময়

سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ، وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

"সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা অবিহামদিকা, আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা আস্তাগফিরুকা অ আতূবু ইলাইক।"

অর্থ ঃ- তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করছি এবং তোমার নিকট তওবা করছি। *(আবু দাউদ ৪৮৫৯নং, তিরমিযী ৩৪৩৩নং, আলবানী বলেছেন, হাদীসটি সহীহ।)*

স্ত্রী সঙ্গমের সময়

بِسْمِ اللهِ، اَللّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا.

"বিসমিল্লাহ, আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ শাইত্বা-না অ জান্নিবিশ শাইত্বা-না মা রাযাক্বতানা।"

অর্থ ঃ- আমি আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখ এবং তুমি যা (সন্তান) দান করেছ তা থেকে শয়তানকে দূরে রাখ। *(বুখারী ৩২৭১নং ও মুসলিম ১৪৩৪নং)*

শয়নকালে যা পড়া হয়

بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَحْيَا وَأَمُوْتُ

“বিসমিকাল্লা-হুম্মা আহয়্যা অ আমূতু।”

অর্থঃ- তোমার নামেই হে আল্লাহ! আমরা বাঁচি ও মরি।

শয়নকারী দুই করতলকে একত্রিত করে তাতে হাল্কা ফুঁক দেবে এবং ‘কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক্ব’ ও ‘কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস’ পাঠ করবে। তারপর যথাসম্ভব সারা শরীরে করতলদ্বয়কে বুলিয়ে নেবে। মাথা, মুখমন্ডল ও দেহের অগ্রভাগ থেকে শুরু করবে। এইরূপ তিনবার করবে। *(বুখারী ৫৭৪৮-নংও মুসলিম ২৭১১নং)*

(নিম্নের দুআও পড়া হয়,)

بِاسْمِكَ رَبِّيْ وَضَعْتُ جَنْبِيْ، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ.

“বিসমিকা রাব্বী অযা’তু জামবী অবিকা আরফাউহু, ফাইন আমসাকতা নাফসী ফারহামহা অইন আরসালতাহা ফাহফাযহা বিমা তাহফাযু বিহী ইবাদাকাস স্বা-লিহীন।”

অর্থ ঃ- তোমার নামেই-হে আমার প্রভু! আমার পার্শ্বকে রাখলাম এবং তোমার নামেই তা উঠাব। তাই যদি তুমি আমার আত্মাকে রুখে নাও তাহলে তার প্রতি রহম কর। আর যদি ছেড়ে দাও তাহলে তুমি তাই দিয়ে তার হিফাযত কর যা দিয়ে তোমার নেক বান্দাদের হিফাযত করে থাক। *(বুখারী ৬৩২০নং ও মুসলিম ২৭১৪নং)*

ডান হাতকে গালের নিচে রেখে তিনবার পড়বে,

اَللَّهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ.

“আল্লাহুম্মা ক্বিনী আযা-বাকা য়্যাউমা তাবআষু ইবা-দাক।”

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমাকে সেদিন তোমার আযাব থেকে বাঁচাবে- যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে পুনরুত্থিত করবে। *(আবু দাউদ ৫০৪৫নং, তিরমিযী ৩৩৯৮-নং ও আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।)*

যে ব্যক্তি **لاَ إِلـهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْـدَهُ لاَ شَـرِيْـكَ لَـهُ، لَـهُ الْـمُـلْـكُ، وَلَـهُ الْـحَمْـدُ، وهُـوَ عَـلَى كُلِّ شَيْءٍ قَـدِيْـرٌ.**

"লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর" ১০ বার পাঠ করবে সে ব্যক্তি ইসমাঈলের বংশের চারটি জীবনকে দাসত্বমুক্ত করার সমান সওয়াবের অধিকারী হবে। *(বুখারী ৬৪০৪নং ও মুসলিম ২৬৯৩নং)*

বিসমিল্লা-হির রাহমা- নির রাহীম

প্রাত্যহিক আযকারের যা কিছু আমাদের ভাই সঞ্চয়ন করেছেন তা অবহিত হলাম এবং তা সংক্ষিপ্ত ফলপ্রসূ পুস্তিকারূপে পেলাম। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা যে, তিনি যেন এর দ্বারায় সকলকে উপকৃত করেন এবং সংকলকের নিকট থেকে তা কবুল করেন।

বলেছেন এর লেখকঃ মুহাম্মাদ বিন সা-লেহ আলউসাইমীন

৬/৬/১৪০৫ হিঃ

জালসা বা দর্সের পর হাত তুলে জামাআতী দুআ

প্রশ্ন ঃ- সরাসরি কোরআন তেলাঅতের পর জামাতবদ্ধভাবে দুআ করা যায় কি? যেমন এক ব্যক্তি দুআ করবে এবং বাকী লোক তার দুআর উপর আমীন বলবে এবং এইভাবে অবিরাম প্রত্যেক দর্সের শেষে দুআ করা বিধেয় কি ?

উত্তর ঃ- যিক্র ও ইবাদত মূলতঃ নির্দেশ-সাপেক্ষ। অর্থাৎ শরীয়তের নির্দেশ বিনা আল্লাহর কোন ইবাদত করা যাবে না এবং তিনি যা বিধিবদ্ধ করেছেন তা ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা তাঁর ইবাদত করা যাবে না। অনুরূপভাবে ইবাদতকে সাধারণকরণ, নির্দিষ্ট সময়ীভূতকরণ, এর নির্দিষ্ট পদ্ধতি বর্ণন,

নির্দিষ্ট সংখ্যা নির্ধারণ প্রভৃতিও নির্দেশ-সাপেক্ষ। সুতরাং যে যিক্র ও ইবাদত আল্লাহ তাআলা কোন সময়, সংখ্যা, স্থান অথবা পদ্ধতি দ্বারা নির্দিষ্ট না করেই বিধিবদ্ধ করেছেন সে সমস্ত যিক্র ও ইবাদতে কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি, সময় বা সংখ্যা ইত্যাদির অনুবর্তন আমাদের জন্য বৈধ নয়। বরং আমরা ঐরূপ সাধারণভাবেই তাঁর ইবাদত করব যেভাবে বিধেয় করা হয়েছে। আর বাচনিক বা কর্মগত দলীলসমূহে যে ইবাদতের সময়, সংখ্যা, স্থান বা পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা হয়েছে আমরা কেবল শরীয়তে প্রমাণিত সেই সমস্ত নির্দিষ্ট গুণের ইবাদতই যথা নিয়মে পালন করব।

কিন্তু নামায, কুরআন তিলাঅত অথবা প্রত্যেক দর্সের শেষে ইমামের দুআ করা ও মুক্তাদীদের 'আমীন-আমীন' বলা অথবা সকলে মিলিতভাবে একাকী জামাআতী দুআ করা রসূল ﷺ হতে; তাঁর কথা, কর্ম বা মৌনসমর্থনে প্রমাণিত নয়। আর এ কর্ম তাঁর খুলাফায়ে রাশেদীন ও সকল সাহাবাবৃন্দের কারো নিকট হতেও বিদিত ও পরিচিত নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি নামাযসমূহের পর, প্রত্যেক কুরআন পাঠের শেষে অথবা প্রত্যেক দর্সের শেষে জামাআতী দুআ নিয়মিত করে থাকে সে দ্বীনে বিদ্আত রচনা করে এবং তাতে অভিনব সেই কর্ম উদ্ভাবন করে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়। পরন্তু মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমাদের এ (দ্বীনী) বিষয়ে অভিনব কিছু রচনা করে যা ওর অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত।" *(লাজনাহ দা-য়েমাহ, মাজাল্লাতুল বহূসিল ইসলামিয়্যাহ ২১/৫২)*

ওযু হল সেই ওয়াজেব পবিত্রতা অর্জনের নাম যা ছোট অপবিত্রতা; যেমন প্রস্রাব, পায়খানা, বাতকর্ম, গভীর নিদ্রা এবং উটের মাংস খাওয়া দরুন করতে হয়।

ওযুর নিয়ম

১- ওযুকারী প্রথমে অন্তরে ওযুর নিয়ত করবে এবং মুখে তা উচ্চারণ করবে না; কারণ, মহানবী ﷺ তাঁর ওযু, তাঁর নামায এবং তাঁর আরো অন্যান্য সকল ইবাদতের নিয়ত মুখে উচ্চারণ করেন নি। আর যেহেতু আল্লাহ অন্তরের খবর জানেন; সুতরাং সে বিষয়ে খবর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

২- অতঃপর বিসমিল্লা-হ বলবে।

৩- অতঃপর কব্জি পর্যন্ত দুই হাত ধোবে।

৪- অতঃপর পানি দ্বারা তিনবার কুল্লি করবে ও নাক ঝাড়বে।

৫- অতঃপর তিনবার চেহারা ধোবে; এক কান থেকে অপর কান পর্যন্ত চওড়ায় এবং কপালে চুল গজানোর স্থান থেকে দাড়ির নিচের অংশ পর্যন্ত লম্বায় পূর্ণ মুখমন্ডল ধৌত করবে।

৬- অতঃপর আঙ্গুল থেকে কনুই পর্যন্ত উভয় হাতকে তিনবার ধৌত করবে; প্রথমে ডান হাত ও পরে বাম হাত ধোবে।

৭- অতঃপর একবার মাথা মাসাহ করবে; দুই হাত ভিজিয়ে মাথার সামনের অংশ থেকে শুরু করে শেষ অংশ পর্যন্ত ফেরাবে। তারপর পুনরায় হাত দুটিকে মাথার সামনের অংশের দিকে ফিরিয়ে আনবে।

৮- অতঃপর একবার কান মাসাহ করবে; উভয় তর্জনী আঙ্গুলকে উভয় কানের ভিতরের অংশে প্রবেশ করিয়ে ভিতরের দিক এবং উভয় বুড়ো আঙ্গুল দ্বারা কানের বাইরের দিক মাসাহ করবে।

৯- অতঃপর তিনবার আঙ্গুল থেকে গাঁট পর্যন্ত উভয় পা-কে তিন বার ধৌত করবে; প্রথমে ডান পা ও পরে বাম পা ধোবে।

গোসল সেই ওয়াজেব পবিত্রতা অর্জনের নাম যা বড় অপবিত্রতা; যেমন সঙ্গমজনিত নাপাকী ও মহিলাদের মাসিক হেতু করতে হয়।

গোসলের নিয়ম

১- প্রথমে মুখে উচ্চারণ না করে কেবল অন্তরে গোসলের নিয়ত করবে।

২- অতঃপর বিসমিল্লা-হ বলবে।

৩- অতঃপর পূর্ণ ওযু করবে।

৪- অতঃপর তিনবার মাথায় পানি ঢালবে।

৫- অতঃপর সারা দেহ ধৌত করবে।

তায়াম্মুম

তায়াম্মুম হল সেই ব্যক্তির ওযু ও গোসলের পরিবর্তে মাটি দ্বারা ওয়াজেব পবিত্রতা অর্জনের নাম, যে ব্যক্তি পানি না পায় অথবা ব্যবহারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তায়াম্মুমের নিয়ম

১- প্রথমে ওযু বা গোসল যার পরিবর্তে তায়াম্মুম করছে তার নিয়ত করবে।

২- অতঃপর মাটি অথবা মাটি লেগে থাকা দেওয়াল ইত্যাদিতে দুই হাত মারবে। অতঃপর তদ্দ্বারা চেহারা ও কব্জী পর্যন্ত দুই হাত মাসাহ করবে।

(রিসালাহ, শায়খ ইবনে উসাইমীন)

পবিত্রতা অর্জনে কিছু ভুল আচরণ।

১- ওযু গোসল বা তায়াম্মুমের শুরুতে মুখে নিয়ত পড়া ।

২- ওযু, গোসল বা তায়াম্মুমের শুরুতে ‘বিসমিল্লা-হ’ না বলা।

৩- ওযুর প্রত্যোক অঙ্গ ধোয়ার সময় ‘বিসমিল্লা-হ’ অথবা নির্দিষ্ট দুআ পড়া ।

৪- ঘুম থেকে জেগে উঠে ওযু করার সময় প্রথমে দুই হাত না ধুয়ে পানির পাত্রে হাত ডুবানো।

৫- পানি বেশী বেশী খরচ করা।

৬- পূর্ণরূপে ওযু না করা।

৭- কনুই অবধি পুরো হাত না ধোয়া।

৮- গর্দান মাসাহ করা। (এটি বিদআত)

৯-অনেকের ধারণা এই যে, অপবিত্র না হলেও প্রত্যেক ওযুর পূর্বে শরমগাহ ধুতে হয়।

১০- কিছু লোক বিশেষ করে মোটা ব্যক্তি যখন গোসল করে তখন তার দেহের ভাঁজের ভিতর অংশে পানি পৌঁছে না। কারণ, দেহের কিছু মাংস পরস্পরের উপর চেপে থাকে যেমন বুক ও পেটের অবস্থা; পানি ঢালার সময় কেবল উপরের অংশে পৌঁছে অথচ তার নিচে শুষ্ক থেকে যায়। ফলে গোসলও অসম্পূর্ণ হয়।

১১- কিছু লোক তাদের দেহের কিছু অংশ ওযু অথবা গোসলের সময় পানি না পৌঁছিয়েই ছেড়ে দেয়। যেমন আঙ্গুলের ফাঁক বিশেষ করে দু পায়ের আঙ্গুলসমূহের মধ্যবর্তী স্থল শুষ্ক থেকে যায়। ওযু করার সময় দুই পায়ের উপর কেবল পানিই ঢেলে থাকে অথচ আঙ্গুলের ফাঁকে-ফাঁকে পানি পৌঁছে না। অনুরূপ অনেকের গোড়ালিও শুষ্ক থেকে যায়।

১২- অনেক লোকের হাতে ঘড়ি অথবা আঙ্গুলে আংটি থাকে। ফলে ওযুর সময় তার নিচের অংশ শুষ্ক থেকে যায়।

১৩- কিছু লোকের হাতে এক প্রকার পেন্ট লেগে থাকে যদ্দ্বারা দেওয়াল রঙানো হয়। এই প্রকার রঙ হাতে লেগে থাকলে চামড়ায় পানি পৌঁছে না। ফলে ওযু অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

১৪- অনেক মহিলা তাদের নখে নখপালিশ ব্যবহার করে; যার মধ্যে গাঢ়তা আছে। এতে নখে পানি পৌঁছতে সম্পূর্ণ বাধা দেয়, ফলে ওযু হয় না।

১৫- ওযুর শেষে আকাশের দিকে মাথা তুলে দুআ অথবা 'ইন্না আনযালনা' পড়া।

১৬- নামায না থাকা সত্ত্বেও ওযুর উপর ওযু করা।

১৭- কিছু লোক আছে যারা স্ত্রী-সঙ্গম করে এবং বীর্যপাত না হলে নিজে গোসল করে না এবং স্ত্রীকেও গোসল করতে আদেশ দেয় না। যা মহাভুল।

১৮- ফরয গোসলের পর কাপড় পরার পূর্বে কিছু লোকের হাত নিজ লজ্জাস্থানে পড়ে; অথচ তা কিছু মনেই করে না। আর সেই ওযু-গোসলেই নামায পড়ে থাকে!

১৯- কিছু লোকের বিশ্বাস যে, ওযুর প্রত্যেক অঙ্গ তিন তিনবার না ধুলে ওযুই হয় না।

২০- ওযুর সকল বা কিছু অঙ্গ তিনের অধিকবার ধৌত করা।

২১- যমযমের পানি দ্বারা ওযু না করা এবং এ পানিতে ওযু করতে দ্বিধাবোধ করা, আর এর পরিবর্তে তায়াম্মুম করা!

২২- কিছু মহিলা আছে যারা মাসিক থেকে পবিত্র হওয়ার পর শেষ সময় পর্যন্ত গোসল পিছিয়ে দেয়। যা মহাভুল। মাসিক বন্ধ হওয়ার সাথে-সাথেই গোসল করা জরুরী।

২৩- কিছু লোক আছে যাদের ওযু ভেঙ্গে গেলে মুসাল্লার নিচে হাত মেরে তায়াম্মুম করে জামাআতে নামায পড়ে, অথচ ওযুখানায় পানি মজুদ থাকে!

(মুখালাফাত ফিত্ত্বাহারাতি অসসলা-হ থেকে গৃহীত।)

নামায, তার মর্যাদা ও গুরুত্ব

নামাযঃ- ইসলামের স্তম্ভসমূহের দ্বিতীয় স্তম্ভ। দুই সাক্ষ্য (কলেমা)র পর এটি ইসলামের অধিক তাকীদপ্রাপ্ত স্তম্ভ।

নামাযঃ- দাস ও তার প্রভুর মাঝে এক সেতুবন্ধ। মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের কেউ যখন নামায পড়ে তখন সে তার প্রভুর সহিত গোপনে বাক্যালাপ করে।" *(বুখারী ৫৩১নং)* হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমার ও আমার বান্দার মাঝে নামাযকে দুই ভাগে ভাগ করেছি। আমার বান্দা তাই পায় যা সে প্রার্থনা করে।' সুতরাং বান্দা যখন বলে, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্বজাহানের প্রতিপালক।' তখন আল্লাহ বলেন, 'আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল।' বান্দা যখন বলে, 'যিনি পরম করুণাময় দয়াবান।' তখন আল্লাহ বলেন, 'বান্দা আমার স্তুতি বর্ণনা করল।' বান্দা যখন বলে, 'যিনি বিচার দিবসের অধিপতি।' তখন আল্লাহ বলেন, 'বান্দা আমার মহিমা বর্ণনা করল।' বান্দা যখন বলে, 'আমরা তোমারই উপাসনা করি এবং তোমারই নিকটে সাহায্য ভিক্ষা করি।' তখন আল্লাহ বলেন, 'এটা আমার ও আমার বান্দার মাঝে এবং আমার বান্দার জন্য তাই, যা সে যাচনা করে।' বান্দা যখন বলে, 'আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর; তাদের পথ যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ, তাদের পথ নয় যারা ক্রোধভাজন এবং তাদের পথও নয় যারা পথভ্রষ্ট।' তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'এটা আমার বান্দার জন্য এবং আমার বান্দার জন্য তাই যা সে প্রার্থনা করে।' *(মুসলিম ৩৯৫নং)*

নামাযঃ- বহু ইবাদতের বাগিচা। যাতে রয়েছে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উপাসনার পুষ্পরাশি। যাতে রয়েছে তকবীর; যার দ্বারা নামায আরম্ভ করা হয়। রয়েছে কিয়াম; যাতে নামাযী আল্লাহর কালাম পাঠ করে থাকে। রুকু; যাতে প্রভুকে তা'যীম জানান হয়। কওমা; যা আল্লাহর প্রশংসায় পরিপূর্ণ। সিজদা; যাতে আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করা হয় এবং অনুনয়-বিনয়ের সাথে দুআ করা হয়। বৈঠক; যাতে তাশাহহুদ ও দুআ করা হয়। আর সালামের সহিত যার সমাপ্তি হয়।

নামাযঃ- গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ও বিপদে সাহায্য, নোংরা ও অশ্লীল কর্মে প্রতিবন্ধক। আল্লাহ তাআলা বলেন, (وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلوةِ)

অর্থাৎ, তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। *(সূরা বাক্বারাহ ৪৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

(أُتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلوةَ ، إِنَّ الصَّلَوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ)

অর্থাৎ, তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ আবৃত্তি কর এবং যথাযথভাবে নামায পড়। নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।" *(সূরা আনকাবুত৪৫)*

নামাযঃ- মুমিনদের হৃদয়ের এবং কিয়ামতের জ্যোতি। মহানবী ﷺ বলেন, "নামায জ্যোতি।" *(মুসলিম ২২৩নং)* তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি নামাযের হিফাযত করে তার জন্য তা কিয়ামতের জ্যোতি, দলীল ও পরিত্রাণের কারণ হবে।" *(আহমদ ২/১৬৯, ইবনে হিব্বান ১৪৬৫নং ও ত্বাবারানী, মুনযেরী বলেন, হাদীসটির সনদ উত্তম। মিশকাত ৫৭৮নং)*

নামাযঃ- মুমিনদের অন্তরের প্রফুল্লতা ও চক্ষুর শীতলতা। মহানবী ﷺ বলেন, "নামাযে আমার চক্ষু-শীতলতা করা হয়েছে।" *(আহমদ ৩/১২৮, ১৯৯, ২৮৫পৃঃ, নাসাঈ ৭/৬১পৃঃ, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।)*

নামাযঃ- পাপ মোচন করে, গোনাহ ক্ষালন করে। মহানবী ﷺ বলেন, "কি মনে কর তোমরা? যদি তোমাদের কারো দরজার সন্নিকটে একটি নদী থাকে যাতে সে প্রত্যহ পাঁচবার গোসল করে, তাহলে তার (দেহে) কি কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকবে?" সকলে বলল, 'তার কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকবে না।' তিনি বললেন, অনুরূপই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উপমা। এর দ্বারা আল্লাহ পাপরাশিকে মুছে ফেলেন।" *(বুখারী ৫২৮নং, মুসলিম ৬৬৭)*

তিনি আরো বলেন, "পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং জুমআহ থেকে জুমআহ পর্যন্ত অন্তর্বর্তী-কালীন ঘটিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত, যতক্ষণ কাবীরা গোনাহ (মহাপাপ) না করা হয়।" *(মুসলিম ২৩৩নং)*

"জামাআতের নামায একাকীর নামায অপেক্ষা সাতাশ গুণ উত্তম।" হাদীসটিকে ইবনে উমার ﷺ নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। *(বুখারী ৬৪৫নং, মুসলিম ৬৫০নং)* ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কাল আল্লাহর সহিত মুসলিম হয়ে সাক্ষাৎ করতে আনন্দবোধ করে তার উচিত, আহবান করার (আযানের) সাথে সাথে ঐ নামাযগুলির হিফাযত করা। অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তোমাদের নবীর জন্য বহু হেদায়াতের পথ ও আদর্শ বিধিবদ্ধ করেছেন এবং ঐ (নামায)গুলি হেদায়াতের পথ ও আদর্শের অন্তর্ভুক্ত। যদি তোমরা তোমাদের স্বগৃহে নামায পড়ে নাও, যেমন এই পশ্চাদ্‌গামী তার স্বগৃহে নামায পড়ে থাকে তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর আদর্শ ও তরীকা বর্জন করে ফেলবে। আর যদি তোমরা তোমাদের নবীর আদর্শ ও তরীকা বর্জন করে ফেল তাহলে তোমরা ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে পবিত্রতা অর্জন (ওযু) করে এই মসজিদসমূহের কোন মসজিদের প্রতি (যেতে) প্রবৃত্ত হয়, আল্লাহ তার প্রত্যেক পদক্ষেপের পরিবর্তে একটি করে নেকী লিপিবদ্ধ করেন, এর দ্বারায় তাকে এক মর্যাদায় উন্নীত করেন ও এর দ্বারায় তার একটি পাপ ক্ষয় করেন। আমরা দেখেছি যে, বিদিত কপটতার কপট (মুনাফিক) ছাড়া নামায থেকে কেউ পশ্চাতে থাকত না এবং মানুষকে দুটি লোকের কাঁধে ভর করে হাঁটিয়ে এনে কাতারে খাড়া করা হত। *(মুসলিম ৬৫৪নং)*

নামাযে বিনতিঃ অন্তরকে উপস্থিত রেখে একাগ্রতার সাথে নামাযের হিফাযত ও সুযত্ন করা। যা জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাওয়ার এক হেতু। আল্লাহ তাআ-লা বলেন,

(قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ، وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ،

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُوْنَ، وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ، إِلاَّ عَلَي أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ، وَالَّذِيْنَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ، وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ، أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ، الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ)

অর্থাৎ, মুমিনগণ অবশ্যই সফলকাম হয়েছে; যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র, যারা অসার ক্রিয়া-কলাপ হতে বিরত থাকে, যারা যাকাতদানে সক্রিয়, যারা নিজেদের যৌনাঙ্গ সংযত রাখে, তবে নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসিগণের ক্ষেত্রে অন্যথা করলে তারা তিরস্কৃত নয়। আর যারা এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করে তারা সীমালংঘনকারী। আর যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, এবং যারা নিজেদের নামাযে সযত্নবান। -তারাই হবে অধিকারী; ফিরদাউসের অধিকারী, যাতে ওরা চিরস্থায়ী থাকবে।" *(সূরা মু'মিনূনঃ ১-১১ আয়াত)*

বিশুদ্ধ ও একাগ্রচিত্তে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি-বিধানের উদ্দেশ্যে নামায আদায় করা এবং তা সুন্নায় (সহীহ হাদীসে) বর্ণিত নিয়ম-পদ্ধতির অনুবর্তী হওয়া -এই দু'টিই হল নামায কবুল হওয়ার মৌলিক শর্ত। মহানবী ﷺ বলেন, "সকল আমল (কর্ম) তো নিয়ত দ্বারাই শুদ্ধ হয় এবং মানুষের জন্য তাই প্রাপ্য যার সে নিয়ত (উদ্দেশ্য ও সংকল্প) করে থাকে। *(বুখারী ১নংও মুসলিম ১৯০৭নং)*

তিনি আরো বলেন, "তোমরা ঠিক তেমনভাবে নামায পড় যেমনভাবে আমাকে পড়তে দেখেছ।" *(বুখারী ৬৩১নং)*

লিখেছেন-মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উসাইমীন *১৩/৪/১৪০৬ হিঃ*

মহানবী ﷺ-এর নামায পড়ার পদ্ধতি

(ইমাম ইবনুল কাইয়েমের 'যা-দুল মাআ-দ' এবং শায়খ ইবনে বাযের 'সিফাতু সালা-তিন নাবী ﷺ' থেকে সংগৃহীত।)

১। নিয়তঃ-

নামাযের সময় নামাযী আল্লাহর ইবাদত করার নিয়ত (সংকল্প) করবে এবং অন্তরে নামাযকে নির্দিষ্ট করবে; যদি নির্দিষ্ট নামায হয়। মহানবী ﷺ অথবা কোন সাহাবী কর্তৃক এ কথার উল্লেখ নেই যে, তাঁরা কেউ নিয়ত মুখে উচ্চারণ করেছেন কিংবা 'নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া---' বলেছেন।

২। তাহরীমার তাকবীরঃ-

মহানবী ﷺ যখন নামায পড়তে দন্ডায়মান হতেন তখন কেবলা (কা'বা শরীফ)কে সামনে করতেন এবং 'আল্লা-হু আকবার' বলতেন। হাত দুটিকে-তার আঙ্গুলগুলোকে প্রলম্বিত রেখে কেবলার সম্মুখ করে কানের উপরিভাগ অথবা কাঁধ বরাবর তুলতেন। অতঃপর ডান হাতটি বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর রাখতেন (বাঁধতেন)।

৩। অতঃপর ইস্তিফতাহর দুআ পাঠ করতেন,

أَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

"আল্ল-হুম্মা বা-ইদ বাইনী অ বাইনা খাত্বা-য়্যা-য়্যা কামা বা-আত্তা বাইনাল মাশরিকি অল-মাগরিব, আল্লা-হুম্মা নাক্বক্বিনী মিনাল খাত্বা-য়্যা, কামা য়্যুনাক্বক্বাস সাউবুল আবয়্যাযু মিনাদ্ দানাস। আল্লা-হুম্মাগসিল খাত্বা-ইয়্যা-য়্যা বিল মা-ই অসসালজি অল-বারাদ।"

অর্থ ঃ- হে আল্লাহ! আমার ও আমার গোনাহসমূহের মাঝে এতটা তফাৎ করে দাও যেমন তুমি পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে তফাৎ করেছ। আল্লাহ গো! আমাকে গোনাহ থেকে ঐ ভাবে পরিষ্কার কর যে ভাবে সাদা কাপড় ময়লা

থেকে পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! আমার গোনাহসমূহকে পানি, বরফ ও করকা দ্বারা ধৌত করে দাও। *(বুখারী৭৪৪নং, মুসলিম ৫৯৮-নং)*

কখনো কখনো নিম্নের দুআ পাঠ করে নামায শুরু করতেন,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

"সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা অ বিহামদিকা অ তাবা-রাকাসমুকা অ তাআ-লা জাদ্দুকা অ লা ইলা-হা গাইরুক।"

অর্থ ঃ- হে আল্লাহ! তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি, তোমার নাম বর্কতময়, তোমার মহিমা অতি উচ্চ এবং তুমি ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই। *(আহমদ ৩/৫০ তিরমিযী ২৪২নং, আবুদাউদ ৭৭৫নং, ইবনে মাজাহ ৮০৪নং, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।)*

৪। অতঃপর (ইস্তিফতাহর পর) বলতেন,

أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

" আঊযু বিল্লা-হি মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম।"

অর্থ ঃ- আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান থকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৫। অতঃপর সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন। কখনো কখনো

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

'বিসমিল্লা-হির রাহমা-নির রাহীম' (জেহরী নামাযে) সশব্দে পড়তেন। তবে সশব্দ অপেক্ষা নিঃশব্দেই অধিকাংশ পড়তেন। আর নিঃশব্দে পড়াই তাঁর নিকট থেকে (শুদ্ধভাবে) প্রমাণিত। সূরা ফাতিহা নিম্নরূপঃ-

(اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اَلرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ، مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ، إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَالضَّالِّيْنَ)

অতঃপর সূরা ফাতিহা পাঠ করা শেষ করলে 'আ-মীন' (কবুল কর) বলতেন। ক্বিরাআত সশব্দে করলে উচ্চস্বরে (আ-মীন) বলতেন এবং তাঁর পশ্চাতে মুকতাদীরাও অনুরূপ বলতেন।

তাঁর ক্বিরাআত ছিল টানা-টানা। প্রত্যেক আয়াত শেষে থেমে যেতেন এবং তাতে আওয়াজ লম্বা করতেন। *(বুখারী ৫০৪৫নং)*

উম্মে সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্বিরাআত ছিল, "বিসমিল্লা-হির রাহমা-নির রাহীম। আলহামদু লিল্লা-হি রাব্বিল আ-লামীন। আর্রাহমা-নির রাহীম। মা-লিকি য়্যাউমিদ্দীন।" *(আহমাদ ৬/৩০২পৃঃ, আবু দাউদ ৪/৪০০১পৃঃ ও তিরমিযী ২/ ১৫২পৃঃ, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।)*

(অর্থাৎ প্রত্যেক আয়াত শেষে থামতেন)।

৬। অতঃপর সূরা ফাতিহা পড়া শেষ করে (একটু) চুপ থাকতেন। *(আহমাদ ৫/৭, ১৫,২০,২১,২৩ আবু দাউদ ৭৭৯নং তিরমিযী ২৫১নং, আলবানী হাদীসটিকে যয়ীফ বলেছেন।)*

৭। সূরা ফাতিহার পর অন্য একটি সূরা পাঠ করতেন। এই দ্বিতীয় সূরাটি ফজরে লম্বা পড়তেন, অবশ্য কখনো কখনো সফর ইত্যাদির কারণে হাল্কা করেও পড়তেন। মাগরেবে অধিকাংশ ছোট সূরা পাঠ করতেন এবং অবশিষ্ট নামাযে মাঝামাঝি সূরা পড়তেন।

৮। সূরা পাঠ শেষ করে রুকু করার পূর্বে একটু চুপ থাকতেন, যাতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফিরে আসে। *(তিরমিযী ২৫১নং, আলবানী হাদীসটিকে যয়ীফ বলেছেন।)*

অতঃপর দুই হাত কাঁধ অথবা কান বরাবর তুলে 'আল্লাহু আকবার' বলে রুকু করতেন। হাতের মুঠি দুটিকে দুই হাঁটুর উপর রেখে ধারণ করতেন। আঙ্গুলগুলিকে ফাঁক ফাঁক করে রাখতেন, হাত (বাহু) দুটিকে পাঁজর থেকে দূরে রাখতেন। পিঠকে সটান ও সোজা বিছিয়ে দিতেন। মাথাকে ঠিক পিঠ বরাবর সোজা রাখতেন, যা পিঠ থেকে না উঁচু হত না নিচু। রুকুতে পাঠ করতেন,

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ “সুবহা-না রাব্বিয়াল আযীম”(তিনবার)

অর্থ ঃ- আমি আমার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি। *(মুসলিম ৭৭২নং)*

কখনো বা এর সাথে পড়তেন,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ

“সুবহা- নাকাল্লা-হুম্মা রাব্বানা অ বিহামদিকাল্লা-হুম্মাগফিরলী।”

অর্থ ঃ- হে আল্লাহ! তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি হে আমাদের প্রভু! আল্লাহ গো! তুমি আমাকে মাফ করে দাও। *(বুখারী ৭৯৪নং, মুসলিম ৪৮৪নং)*

৯। অতঃপর **سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ**

‘সামিআল্লা-হু লিমান হামিদাহ’ (অর্থাৎ যে আল্লাহর প্রশংসা করে তার প্রশংসা তিনি শ্রবণ করেন।) বলে দুই হাত (পূর্বের ন্যায়) তুলে রুকু থেকে মাথা তুলতেন। তারপর যখন সম্পূর্ণভাবে খাড়া হয়ে যেতেন তখন বলতেন,

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ‘রাব্বানা অ লাকাল হামদ্‌।’(অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! সমস্ত প্রশংসা তোমারই নিমিত্তে।)

আর এটাও শুদ্ধভাবে প্রমাণিত যে, তিনি (কখনো কখনো) এই স্থানে বলতেন,

سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللهمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّموَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

“সামি আল্লা-হু লিমান হামিদাহ। আল্লাহুম্মা রাব্বানা অলাকাল হামদু মিলআস সামা-ওয়া-তি অমিলআল আরযি অমিলআ মা শি’তা মিন শাইয়িন বা’দ, আহলাস সানা-ই অল-মাজ্‌দ, আহাক্কু মা ক্বা-লাল আব্‌দ, অ কুল্লুনা লাকা আব্‌দ। লা মা-নিআ লিমা আ’ত্বাইতা অলা মু’ত্বিয়া লিমা মানা’তা অলা য়্যানফাউ যালজাদ্দি মিনকাল জাদ্দ।”

অর্থ ঃ- হে আমাদের প্রভু! তোমারই নিমিত্তে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীপূর্ণ এবং এর পরেও তুমি যা চাও তা পূর্ণ যাবতীয় প্রশংসা। হে প্রশংসা ও গৌরবের অধিকারী! বান্দার সবচেয়ে সত্য কথা,- আর আমরা প্রত্যেকেই তোমার বান্দা- 'তুমি যা প্রদান কর তা রোধ করার এবং যা রোধ কর তা প্রদান করার সাধ্য কারো নেই। আর ধনবানের ধন (তোমার আযাব থেকে মুক্তি পেতে) কোন উপকারে আসবে না।' *(মুসলিম ৪৭৭নং)*

১০। অতঃপর তকবীর বলে সিজদায় পতিত হতেন এবং এ সময় আর হাত তুলতেন না। *(বুখারী ৭৩৮নং)* এই সময় হাতদুটির পূর্বে হাঁটুদ্বয়কে মাটিতে রাখতেন। *(আবু দাউদ ৮৩৮নং,তিরমিযী ২৬৮নং ,নাসাঈ ২/২০৭পৃঃ ইবনে মাজাহ ৮৮২নং, আলবানী হাদীসটিকে যয়ীফ বলেছেন।) (সহীহ হাদীসে হাঁটুর পূর্বে হাত রাখার কথা আছে। -অনুবাদক)*

অতঃপর কপাল ও নাক রাখতেন। সিজদাতে কপাল ও নাককে ভূমির সহিত লাগিয়ে দিতেন। *(বুখারী ৮১২নং)* হাত (বাহু) দুটিকে পাঁজর থেকে দূরে রাখতেন এবং উভয়ের মাঝে এতটা ফাঁক করতেন যাতে তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখা যেত। প্রকোষ্ঠ (কনুই হতে কব্জি পর্যন্ত হাতের অংশ, হাতের রলা) দুটিকে জমিনে বিছিয়ে রাখতেন না বরং উপর দিকে তুলে রাখতেন। *(বুখারী ৮০৭নং)* হাত (চেটো) দুটিকে কাঁধ বরাবর মাটিতে রাখতেন, *(আবু দাউদ ৭২১নং, তিরমিযী ৩৫৫নং, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।)* কখনো বা কান বরাবর বিছিয়ে রাখতেন। *(আবু দাউদ ৭২৮নং,নাসাঈ ৮৭৮নং,আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।)* সিজদায় সোজা থাকতেন (অর্থাৎ পিঠ উঁচু-নিচু না রেখে বরাবর রাখতেন।) পায়ের আঙ্গুলগুলিকে কেবলামুখী করতেন। *(বুখারী ৮২৮নং)* হাতের তেলো ও আঙ্গুলগুলিকে বিছিয়ে দিতেন এবং আঙ্গুলগুলিকে না খুলে রাখতেন, না বন্ধ করে। সিজদায় তিনি পড়তেন,

سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى "সুবহা-না রাব্বিয়াল আ'লা।"(৩ বার)

অর্থ ঃ- আমি আমার সুমহান প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণা করছি। *(মুসলিম ৭৭২নং)*

কখনো বা এর সাথে বলতেন,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ

"সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা রাব্বানা অ বিহামদিকাল্লা-হুম্মাগফিরলী।"

অর্থ ঃ- হে আল্লাহ! তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাকে ক্ষমা কর হে আল্লাহ !

১১। অতঃপর তকবীর বলে এবং হাত না তুলে সিজদা থেকে মাথা তুলতেন। হাত দুটির পূর্বে মাথা উঠাতেন। তারপর বাম পা-কে বিছিয়ে তার উপর বসতেন এবং ডান পা-কে খাড়া রাখতেন। *(বুখারী ২২৮নংও মুসলিম ৪৯৮-নং)* পায়ের আঙ্গুলগুলিকে কেবলামুখী করে নিতেন। *(নাসাঈ ১১৫৭নং, ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, এটি নামাযের একটি সুন্নত। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।)* হাত দুটিকে দুই জাঙ্গের উপর রাখতেন। ডান হাতের কনুইকে ডান জাঙ্গের উপর এবং মুঠিকে হাঁটুর উপর রাখতেন। অতঃপর দুটি আঙ্গুল (বৃদ্ধা ও মধ্যমা)কে পরস্পর মিলিয়ে বালার মত করতেন এবং (তর্জনী) আঙ্গুল উঠিয়ে দুআ করতেন আর হিলাতেন। ওয়াইল বিন হুজ্র এরূপই তাঁর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। *(আবু দাউদ ৯৫৭নং, নাসাঈ ১২৬৪নং, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।)*

অতঃপর দুই সিজদার মাঝে বলতেন,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي واجْبُرْنِيْ، وَاهْدِنِيْ، وَارْزُقْنِيْ

'আল্লাহুম্মাগফিরলী অরহামনী, অজবুরনী অহদিনী অরযুক্বনী।'

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমার উপর রহম কর, আমার প্রয়োজন মিটাও, আমাকে সৎপথ দেখাও এবং জীবিকা দান কর। *(আবু দাউদ ৮৫০নং, তিরমিযী ২৮৪নং ইবনে মাজাহ ৮৯৮-নং, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।)*

বর্ণিত যে,তিনি দুই সিজদার মাঝে এ দুআও পাঠ করতেন,

رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي

"রাব্বিগফিরলী, রাব্বিগফিরলী।" অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাকে মার্জনা করে দাও। ২বার। *(আবু দাউদ ৮৭৪নং,নাসাঈ ১১৪৪নং,ইবনে মাজাহ ৮৯৭নং, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।)*

দুই সিজদার মাঝে দীর্ঘসময় বসতেন। এই দৈর্ঘ্যের জন্য বলা হত যে, তিনি নিশ্চয় ভুলে গেছেন।' *(বুখারী ৮২৪নং ও মুসলিম ৪৭২নং)*

১২। অতঃপর প্রথম সিজদার মত দ্বিতীয় সিজদা করতেন। তারপর সিজদা থেকে উঠে সোজা হয়ে বসে যেতেন। *(বুখারী ৮২২নং)*

অতঃপর দুই পায়ের পাতার অগ্র ভাগ ও দুই হাঁটুর উপর চাপ রেখে দুই জাঙ্গের উপর ভর করে খাড়া হতেন---যদি এরূপ তাঁর জন্য সহজ হত তাহলে; নচেৎ কষ্ট হলে (দুই হাত) মাটির উপর ভর দিয়ে দ্বিতীয় রাকাতের জন্য উঠে খাড়া হতেন। *(বুখারী ৮২৪নং)*

১৩। যখন দ্বিতীয় রাকাতের জন্য উঠে দন্ডায়মান হতেন তখন সাথে সাথে ক্বিরাআত শুরু করতেন এবং চুপ থাকতেন না *(মুসলিম ৫৯৯নং)* যেমন নামায শুরু করার সময় চুপ থাকতেন। এই রাকআতে 'আউযু বিল্লাহ---' পড়তেন না, যেহেতু নামাযের প্রারম্ভে 'আউযু বিল্লাহ----'ই যথেষ্ট।

দ্বিতীয় রাকআতও প্রথম রাকাআতের অনুরূপই পড়তেন। অবশ্য এতে চারটি বিষয়ে অন্যথা করতেন; চুপ না থাকা, ইস্তেফতাহর দুআ না পড়া, তাহরীমার তকবীর না বলা এবং প্রথম রাকআতের মত এ রাকআতটিকে লম্বা না করা। যেহেতু তিনি দ্বিতীয় রাকআতকে প্রথম রাকআতের তুলনায় ছোট করে পড়তেন। সুতরাং প্রথম রাকআতটি তুলনামূলকভাবে লম্বা হত।

১৪। যখন তাশাহহুদে বসতেন তখন বাম হাতটিকে বাম জাঙ্গের উপর এবং ডান হাতটিকে ডান জাঙ্গের উপর রাখতেন, আর এই হাতের দুই আঙ্গুল অনামিকা ও কনিষ্ঠাকে গুটিয়ে রাখতেন, বৃদ্ধা ও মধ্যমা দিয়ে বালা বানাতেন এবং তর্জনীকে সোজা খাড়া না রেখে-বরং একটু ঝুঁকিয়ে রেখে দুআ করতেন।

চক্ষুদৃষ্টি এই আঙ্গুলের উপর নিবদ্ধ রাখতেন এবং বাম করতলকে বাম জাঙ্গের উপর বিছিয়ে রাখতেন।

এই বৈঠকে বসার পদ্ধতি দুই সিজদার মাঝে বৈঠকে বসার অনুরূপ- যেমন পূর্বে আলোচিত হয়েছে। বাম পায়ের উপর পাছা রেখে বসতেন এবং ডান পা (এর পাতা) কে খাড়া রাখতেন। *(বুখারী ৮২৮নং, মুসলিম ৪৯৮নং)* এই বৈঠকে এই পদ্ধতি ছাড়া অন্য কিছু বর্ণিত হয়নি। এই বৈঠকে তিনি বলতেন,

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلىَ عِبَادِ اللّهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

“আত্ তাহিয়্যা-তু লিল্লা-হি অস্স্বালা-ওয়া-তু অত্ত্বাইয়িবা-তু আসসালা-মু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিইয়্যু অরাহমাতুল্লা-হি অবারাকা-তুহ। আসসালা-মু আলাইনা অআলা ইবা-দিল্লা-হিস স্বা-লিহীন। আশ্হাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসূলুহ।”

অর্থঃ- যাবতীয় মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহর নিমিত্তে। হে নবী! আপনার উপর সকল প্রকার শান্তি, আল্লাহর রহমত এবং তাঁর বরকত বর্ষণ হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাগণের উপর সর্বপ্রকার শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষি দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন যোগ্য মা’বুদ নেই এবং আরো সাক্ষি দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর দাস ও প্রেরিত রসূল। *(বুখারী ৮৩১নং, মুসলিম ৪০২নং)* তিনি এই তাশাহহুদকে খুবই হাল্কা পড়তেন। মনে হত, যেন তিনি তপ্ত পাথরে বসতেন। *(কিন্তু এ হাদীসটি যয়ীফ। যয়ীফ আবূ দাঊদ ১৭৭, যয়ীফ তিরমিযী ৫৭, যয়ীফ নাসাঈ ৫৫নং, তামামুল মিন্নাহ ২২৪পৃঃ)*

১৫। অতঃপর তকবীর বলে দুই পায়ের পাতার অগ্রভাগ ও দুই হাঁটুর উপর বল করে এবং (দুই হাত দ্বারা) দুই জাঙ্গের উপর ভর করে খাড়া হতেন।

যেমন পূর্বে বলা হয়েছে। *(এ ব্যাপারে হাদীসটিও যয়ীফ, যেমন পূর্বে উল্লেখ হয়েছে)* আর দুই হাতকে দুই কাঁধ বরাবর তুলতেন, যেমন নামাযের প্রারম্ভে তুলতেন। *(বুখারী ৭৩৯নং)*

১৬। অতঃপর কেবল মাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন। আর এ কথা প্রমাণিত নয় যে, তিনি শেষ দুই রাকআতে ফাতেহার পরে অন্য সূরা পড়তেন। (যোহর ও আসর ব্যতিক্রম।)

১৭। যখন তিনি শেষ বৈঠকে বসতেন তখন পাছা জমিনে লাগিয়ে দিতেন, অর্থাৎ বাম পাছার উপর ভর করে বসতেন এবং ডান জঙ্ঘা (হাঁটু হতে গাঁট পর্যন্ত পায়ের অংশ বা রলা)র নিচে দিয়ে বাম পায়ের পাতার অর্ধেক খানি বের করে রাখতেন। *(আবু দাউদ ৯৬৫নং, নামাযের অধ্যায়ে ইবনে লাহীআহর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। যাঁর ব্যাপারে সমালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু হাদীসটি অন্য সূত্রে আবু হুমাইদ ইত্যাদি থেকেও এসেছে। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন। আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন।)* ডান হাতের প্রকোষ্ঠকে ডান জাঙ্গের উপর বিছিয়ে দিতেন এবং জাং হতে দূরে রাখতেন না; যাতে কুনুই এর শেষ প্রান্ত জাঙ্গের শেষ প্রান্তে হত। অতঃপর এই হাতের দুটি আঙ্গুল কনিষ্ঠা ও অনামিকাকে গুটিয়ে রাখতেন। বৃদ্ধা ও মধ্যমা দ্বারা বালার মত গোলাকার বানাতেন এবং তর্জনী হিলিয়ে সেই সঙ্গে দুআ করতেন। *(আবু দাউদ ৭২৬নং, তিরমিযী ২৯৩নং, নাসাঈ ৮৮৮নং, ইবনে মাজাহ ৯১২নং, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।)* পক্ষান্তরে আঙ্গুলগুলিকে প্রলম্বিত রেখে বাম হাতকে বাম জাঙ্গের উপর রাখতেন। *(মুসলিম ৫৭৯নং)* তাশাহহুদ, হাত তোলা, রুকু ও সিজদা করার সময় তাঁর আঙ্গুলগুলিকে কেবলামুখী করতেন এবং পায়ের আঙ্গুলগুলিকেও সিজদায় কেবলামুখী করে রাখতেন।

অতঃপর তাশাহহুদ পড়তেন।শেষ তাশাহহুদে তিনি বলতেন,

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلىَ عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أنْ لاَ اِلٰهَ إلاّ اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ،

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ، إنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلى مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِ مُحَمَّدٍ،كَمَا بَارَكْتَ عَلى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَىآلِ إبْرَاهِيْمَ، إنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

আত্-তাহিয়্যা-তু লিল্লা-হি অসস্বালা-ওয়া-তু অত্বত্বাইয়িবা-তু আসসালা-মু আলাইকা আয়্যুহান নাবিইয়্যু অরাহমাতুল্লা-হি অবারাকা-তুহ। আসসালা-মু আলাইনা অআলা ইবা-দিল্লা-হিস স্বা-লিহীন। আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অআশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসূলুহ।

(দরূদ)

আল্লা-হুম্মা স্বাল্লি আলা মুহাম্মাদিঁউ অ আলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা স্বাল্লাইতা আলা ইবরা-হীমা অ আলা আ-লি ইবরা-হীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

আল্লা-হুম্মা বা-রিক আলা মুহাম্মাদিঁউ অআলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা বা-রাকতা আলা ইবরা-হীমা অ আলা আ-লি ইবরা-হীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।”

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি হযরত মুহাম্মাদ ও তাঁর বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ কর, যেমন তুমি হযরত ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত গৌরবান্বিত। হে আল্লাহ! তুমি হযরত মুহাম্মাদ ও তাঁর বংশধরের উপর বরকত বর্ষণ কর, যেমন তুমি হযরত ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরের উপর বর্কত বর্ষণ করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত গৌরবান্বিত।

১৯। অতঃপর তাশাহহুদ (এবং দরূদ) পাঠ শেষ করলে দুআ করার আগে চারটি জিনিস থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন ও বলতেন,

أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذاَبِ جَهَنَّمَ وعَذاَبِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

“আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন আযা-বি জাহান্নামা অ আযা-বিল ক্বাবরি অমিন ফিতনাতিল মাহ্য়্যা অল মামা-তি অমিন শার্রি ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জা-ল।”

অর্থঃ- আল্লাহ গো! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং দাজ্জালের ফিতনার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

‘আত্তাহিয়্যাতু’ (ও দরূদ) পড়ার পর এই আশ্রয় প্রার্থনা করা কিছু ওলামার নিকট ওয়াজেব। কেননা আল্লাহর রসূল ﷺ এই চারটি বিষয় থেকে আশ্রয় চাইতে আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, “যখন তোমাদের কেউ শেষ তাশাহহুদ থেকে ফারেগ হবে, তখন সে যেন চারটি বিষয় থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চায়।” এবং ঐ বিষয়গুলি উল্লেখ করেন। *(মুসলিম ৫৮৮নং)*

২০। এর পর তিনি নামাযে (এই ক্ষেত্রে) বিভিন্ন প্রকার দুআ করতেন। এই দুআসমূহের একটি দুআ যা তিনি আবু বকর رضي الله عنه-কে বলতে শিক্ষা দিয়েছিলেন,

اللهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيراً وَّلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إلاَّ أنتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

“আল্লা-হুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী যুলমান কাসীরাঁউ অলা য়্যাগফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্তা ফাগ্‌ফিরলী মাগ্‌ফিরাতাম মিন ইনদিক, অরহামনী ইন্নাকা আন্তাল গাফূরুর রাহীম।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি নিজের উপর বহু অত্যাচার করেছি এবং তুমি ছাড়া কেউ পাপসমূহ মার্জনা করতে পারে না। অতএব তুমি আমাকে তোমার তরফ থেকে মার্জনা করে দাও। আর আমার উপর দয়া কর, নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল দয়াবান। *(বুখারী ৮৩৪নংও মুসলিম ২৭০৫নং)*

এই দুআ সমূহের আর একটি দুআ,

اَللّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ.

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল মা'সামি অল মাগরাম।"

অর্থঃ- আল্লাহ গো! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট পাপ ও ঋণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(বুখারী ৮৩২নং, মুসলিম ৫৮৯নং)*

২১। অতঃপর ডান দিকে (মুখ ফিরিয়ে) সালাম ফিরতেন,

السَّلام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

"আসসালা-মু আলাইকুম অরাহমাতুল্লা-হ।"

আর এতে তাঁর ডান গালের শুভ্রতা পরিদৃষ্ট হত। অনুরূপ বাম দিকে সালাম ফিরতেন, "আসসালা-মু আলাইকুম অরাহমাতুল্লা-হ।" আর এতে তাঁর বাম গালের শুভ্রতা পরিদৃষ্ট হত। *(আবু দাউদ ৯৯৬নং, তিরমিযী ২৯৫নং, নাসাঈ ১৩১৫নং, ইবনে মাজাহ ৯১৪নং, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।)*

২২। সালাম ফিরার পর কেবলা মুখে বসেই তিনবার বলতেন, 'আস্তাগফিরুল্লাহ' (অর্থাৎ আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি) এবং এক বার বলতেন,

اَللّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ

"আল্লা-হুম্মা আন্তাস সালা-মু অমিনকাস সালা-মু তাবা-রাকতা ইয়া যাল জালা-লি অল-ইকরা-ম।"

অর্থঃ- হে আল্লাহ তুমি সর্বত্রুটিমুক্ত (শান্তি) এবং তোমার তরফ থেকেই শান্তি, তুমি বর্কতময় হে মহিমাময় ও মহানুভব। *(মুসলিম ৫৯১নং)*

এতটুকু বলার সময়কাল পর্যন্ত কেবলা মুখেই থাকতেন। অতঃপর কখনো বা ডান দিকে হতে আবার কখনো বা বাম দিক হতে মুকতাদীদের প্রতি ঘুরে বসতেন।

ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, "আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বহুবার বাম দিক হতে ঘুরতে দেখেছি। *(বুখারী ৮৫২নংও মুসলিম ৭০৭নং)*

আনাস ﷺ বলেন, 'আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে অধিকাংশ ডান দিক হতে ঘুরে বসতে দেখেছি। *(মুসলিম৭০৮নং)*

বিসমিল্লা-হির রাহমা-নির রাহীম

এই পুস্তিকার বিষয়ে আমি অবহিত হলাম এবং এটিকে উপকারী রূপে পেলাম। আল্লার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন এর দ্বারা (মানুষকে) উপকৃত করেন।

বলেছেন এর লেখকঃ-

মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উসাইমীন। ২৮/ ৫/ ১৪০৬ হিঃ

ফরয নামাযের পর পঠনীয় যিক্‌রসমূহ

আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায এর তরফ থেকে অত্র পুস্তিকা পাঠকারী সমস্ত মুসলিমের প্রতি-

মহানবী ﷺ-এর অনুকরণে প্রত্যেক ফরয নামাযের পর নিম্নোক্ত যিকর সমূহ পাঠ করা সুন্নত ঃ-

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ، أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ، أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ.

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

'আসতাগফিরুল্লা-হ।' (তিন বার)

"আল্লাহুম্মা আন্তাস সালা-মু অ মিনকাস সালা-মু তাবা-রাকতা ইয়া যাল জালা-লি অল ইকরা-ম।"

"লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।"

অর্থঃ- আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই জন্য সারা রাজত্ব, তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সর্ববস্তুর উপর সর্ব শক্তিমান।

لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّهِ ، لاَ إِلهَ إِلاّ اللّهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاّ إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ، وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ. اَللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

"লা হাউলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ। লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অলা না'বুদু ইল্লা ইয়্যা-হু লাহুন নি'মাতু অলাহুল ফাযলু অলাহুস সানা-উল হাসান। লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুখলিসীনা লাহুদ্দীন। অলাউ কারিহাল কা-ফিরূন। আল্লাহুম্মা লা মা-নিআ লিমা আ'ত্বাইতা অলা মু'ত্বিয়া লিমা মানা'তা অলা য়্যানফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দ।"

অর্থঃ- আল্লাহর প্রেরণা ছাড়া পাপ থেকে ফিরার এবং সৎকাজ করার সাধ্য কারো নেই। আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বুদ নেই। আমরা তিনি ছাড়া আর কারো উপাসনা করিনা। তাঁরই যাবতীয় সম্পদ, অনুগ্রহ এবং উত্তম প্রশংসা। আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই। আমরা বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁরই আনুগত্য করি, যদিও কাফেরদল তা অপছন্দ করে। হে আল্লাহ! তুমি যা দান কর তা রোধকারী এবং তুমি যা রোধ কর তা দানকারী কেউ নেই, আর ধনবানের ধন কোন উপকারে আসবে না।

এরপর বলবে, 'সুবহা-নাল্লা-হ' (আমি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করি) ৩৩ বার।

'আলহামদু লিল্লা-হ'(সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর) ৩৩ বার।

'আল্লা-হু আকবার'(আল্লাহ সর্বাপেক্ষা মহান) ৩৩ বার।

অতঃপর একশত পূরণ করতে নিম্নের দুআ এক বার বলবে,

لاَ إِلَهَ إلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

"লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।"

অর্থাৎ ঃ- আল্লাহ ব্যতীত কেউ যোগ্য উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই।তাঁরই জন্য সারা রাজত্ব এবং তাঁরই নিমিত্তে সকল গুণগান আর তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

অতঃপর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে।

(اَللّهُ لآ إِلهَ إلاّ هُوَ الحَيُّ القَيُّوْمُ، لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلاَ نَوْمٌ، لَهُ مَا فِيْ السَّموات وَمَا فِيْ الأَرْضِ، مَنْ ذَالَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَآءَ، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّموات وَالأَرْضَ، وَلاَ يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ)

অর্থ ঃ- আল্লাহ; তিনি ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, অবিনশ্বর। তাঁকে তন্দ্রা এবং নিদ্রাও স্পর্শ করে না। আকাশ পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছু তাঁরই। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের (মানুষের) সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত

আছেন। যা তিনি ইচ্ছা করেন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর কুর্সী আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত। আর ওদের (আকাশ ও পৃথিবীর) রক্ষণা-বেক্ষণ তাঁর পক্ষে কঠিন নয়, তিনি অতি উচ্চ মহামহিম।

অতঃপর যোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজর প্রত্যেক নামাযের পর সূরা 'কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ', সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পাঠ করবে। মাগরিব ও ফজরের নামাযের পর এ সূরাগুলিকে তিনবার করে পড়বে। আর এটাই হল উত্তম।

আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ, তাঁর বংশধর, তাঁর সহচরবৃন্দ এবং কিয়ামত দিবস পর্যন্ত বিশুদ্ধচিত্তে তাঁর অনুসারীদের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন।

বলেছেনঃ-
আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায

নামাযে নামাযীদের কিছু ত্রুটির উপর সতর্কীকরণ

(শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আল জিবরীন)

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর নিমিত্তে। করুণা ও শান্তি বর্ষিত হোক শেষ নবী মুহাম্মদ, তাঁর বংশধর এবং সহচরবৃন্দের উপর।

অতঃপর নামাযের গুরুত্ব ও মাহাত্মের প্রতি দৃষ্টি রেখে, যা দ্বারা দায়িত্ব পালন হয় এবং এই ইবাদত আদায়ের উপর নির্ধারিত প্রতিদান লাভ করা সম্ভব হয় তা দ্বারা নামাযকে সম্পূর্ণ করতে যত্নবান হওয়ার উদ্দেশ্যে, এবং বহু সংখ্যক লোককে নামাযের পদ্ধতিতে বর্ণিত নির্দেশাবলীর অন্যথাচরণ করতে দেখা গেলে -কিছু অন্যথাচরণের উপর সতর্কীকরণ আশু প্রয়োজন হল; যার প্রতি কিছু হিতাকাঙ্খী মানুষ অবহিত হয়েছেন; যদিও এ সবের অধিকাংশই

নামাযের সুন্নত ও পরিপূরক কর্মাবলীর পর্যায়ভুক্ত। অন্যথাচরণগুলি নিম্নরূপ ঃ-

১। মসজিদ যেতে খুবই তাড়াহুড়া করা। অথবা মসজিদে (জামাআতে) নামায পড়ার জন্য কিংবা রুকু পাওয়ার জন্য খুব শীঘ্র চলা। এতে ধীরতা ও শিষ্টতা এবং নামাযের মর্যাদা নষ্ট হয়। অন্যান্য নামাযীদের ডিষ্টার্ব হয়। হাদীসে বর্ণিত যে, "যখন নামাযের একামত হয়ে যায় তখন তোমরা ছুটে এস না, বরং ওর প্রতি (সাধারণভাবে) হেঁটে এস। তোমরা ধীরতা ও শিষ্টতা অবলম্বন কর।" *(বুখারী, মুসলিম)*

২। যা মানুষের নাকে ঘৃণিত দুর্গন্ধ বস্তু যেমন, বিড়ি, সিগারেট, হুঁকা ইত্যাদি - যা কুর্রাস (পিঁয়াজ ও রসুন পাতার মত এক প্রকার সবজি),রসুন ও পিঁয়াজ- যাতে ফিরিশ্তা ও মানুষে কষ্ট পায় - তার থেকেও অধিক নিকৃষ্টতর গন্ধযুক্ত বস্তু খাওয়া বা ব্যবহার করা। অতএব নামাযীর কর্তব্য, ঐ সমস্ত দুর্গন্ধময় বস্ত থেকে দূরে থেকে সুবাসিত হয়ে মসজিদে আসা।

৩। ইমামকে রুকু অবস্থায় পেলে অনেক নামাযী -যারা জামাআত শুরু হওয়ার পর আসে তারা- রুকুতে ঝুঁকে যাওয়ার পর তকবীর বলে। অথচ মৌলিক নিয়ম হল, তাহরীমার তকবীর দন্ডায়মান অবস্থায় বলা এবং তারপর রুকু করা। যদি তাড়াতাড়ি করে রুকুর তকবীর ত্যাগ করে দেয় তবে তার নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং কেবল তাহরীমার তকবীরই যথেষ্ট হবে।

৪। নামায পড়তে পড়তে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করা, সম্মুখের দিক অথবা ডানে-বামে তাকাতাকি করা; যাতে নামাযে ভুল সংঘটিত হয় এবং মনে মনে কথা জাগে। অথচ দৃষ্টি অবনত করতে এবং সিজদার স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে নামাযী আদিষ্ট হয়েছে।

৫। নামাযে অধিক নড়া-সরা করা। যেমন দুই হাতের আঙ্গুলকে খাঁজা-খাঁজি করা, নখ পরিষ্কার করা, একটানা পা হিলানো, পাগড়ী,রুমাল বা একাল সোজা

করা ঘড়ি দেখা,বোতাম লাগানো ইত্যাদি; যার কিছু তো নামায নষ্ট করে ফেলে অথবা সওয়াব হ্রাস করে দেয়।

৬। রুকু, সিজদা এবং উঠা-নামা ইমামের আগে আগে করা, অথবা সাথে সাথে করা অথবা ইমামের (বহু) পরে পরে করা। সুতরাং এ বিষয়ে সতর্কতা ওয়াজেব।

৭। অপ্রয়োজনে তারাবীহ ইত্যাদি নামাযে মুসহাফ (কুরআন) দেখে পড়া অথবা মুসহাফ নিয়ে ইমামের অনুসরণ করা। যেহেতু তা অনর্থক কর্মের মধ্যে গণ্য। অবশ্য যদি তাতে কোন উপকার থাকে -যেমন ইমামের ভুল সংশোধন করা ইত্যাদি- তাহলে প্রয়োজন অনুযায়ী (মুসহাফ দেখতে) কোন বাধা নেই।

৮। রুকুতে কুজো হওয়া বা মাথা নিচু করা। কুজো হওয়া বা পিঠকে ধনুকের মত করার ব্যাপারে হাদীসে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। অতএব রুকুকারী তার পৃষ্ঠদেশকে সমতল রাখবে। পিঠ থেকে মাথাকে না উঁচু করবে, না নিচু।

৯। সম্পূর্ণভাবে সিজদা না করা। জমিন থেকে কিছু অঙ্গ উপরে তুলে রাখা। যেমন যে ব্যক্তি পাগড়ীর প্যাঁচের উপর সিজদা করে -অর্থাৎ সে মাথার অগ্রভাগ দ্বারা সিজদা করে এবং তার ললাট জমিনে স্পর্শ করে না, অথবা যে ললাটের উপর সিজদা করে কিন্তু নাক তুলে রাখে অথবা জমিন থেকে পায়ের পাতা দুটিকে উঠিয়ে রাখে। এমন লোকেরা কেবল পাঁচটি অঙ্গের উপরই সিজদা করে, অথচ সিজদার অঙ্গ মোট সাতটি যা হাদীসে প্রসিদ্ধ।

১০। বহু ইমামের নামায এত হাল্কা পড়া; যাতে মুকতাদীগণ তার অনুসরণ করতে সক্ষম হয় না এবং ওয়াজেব যিকর বা দুআ পড়তেও সময় পায় না। এমন নামায পড়া স্থিরচিত্ততার পরিপন্থী; যা হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। সুতরাং রুকু ও সিজদাতে এতটা সময়কাল থামা উচিত, যাতে মুকতাদী ধীর-স্থিরভাবে তাড়াহুড়া না করে তিনবার করে তসবীহ পড়তে সক্ষম হয়।

১১। তাশাহহুদে বসে তর্জনী বা অন্য কোন আঙ্গুলকে ক্রমাগত হিলানো। অথচ দুই সাক্ষ্য প্রদানের সময় (আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ....’

বলার সময়, দুআর সময়) অথবা আল্লাহর নাম উল্লেখের সময় তর্জনীকে একবার কিংবা দুইবার মাত্র হিলাতে হয়।

১২। নামায থেকে বের হওয়ার সময় ও সালাম ফিরার জন্য মুখ ঘুরাবার সময় ডান দিকে অথবা দুই দিকেই দুই হাত হিলিয়ে ইশারা করা। সাহাবাগণ এইরূপ করতেন; যা দেখে নবী ﷺ বলেছিলেন, "কি ব্যাপার, তোমাদেরকে হাত তুলতে দেখছি, যেন তা দুরন্ত ঘোড়ার লেজ?" তখন সকলে হাত তোলা ত্যাগ করলেন এবং কেবল মুখ ফিরানোতেই যথেষ্ট করলেন। *(আবু দাউদ ও নাসাঈ)*

১৩। বহু লোক আছে যারা পরিপূর্ণ লেবাস পরিধান করে না। কেউ তো পায়জামা (প্যান্ট) পরে এবং তার উপর (পেট ও পিঠের উপর) ছোট শার্ট বা কামিস পরে। তারপর যখন সিজদায় যায় তখন শার্ট উপর দিকে উঠে যায় এবং পায়জামা নিচে নেমে যায় ফলে পিঠ ও পাছার কিছু অংশ উম্মুক্ত হয়ে পড়ে; যা লজ্জাস্থানের পর্যায়ভুক্ত এবং তা পশচাতের লোকেরা দেখতে পায়। অথচ লজ্জাস্থানের কিছু অংশ বের হয়ে গেলে নামায বাতিল হয়ে যায়।

১৪। বহু লোক এমন আছে, যারা ফরয নামায থেকে সালাম ফিরার সাথে সাথে পার্শ্ববর্তী নামাযীর সহিত মুসাফাহা করার উদ্দেশ্যে হাত বাড়িয়ে থাকে এবং 'তাক্বাব্বালাল্লা-হ,' অথবা 'হারামান' বলে দুআ করে থাকে, যা বিদ্‌আত এবং সলফ থেকে এ কথা বর্ণিত নেই।

১৫। কতক লোকের অভ্যাস, ফরয নামাযের সালাম ফিরার সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে দুআ করতে শুরু করা এবং বিধিসম্মত যিকর আযকার পাঠ ত্যাগ করা; যা সুন্নতের পরিপন্থী। যিকর আযকার পাঠ করার পর দুআ করা বিধিসম্মত। যেহেতু উক্ত সময়ে দুআ কবুল হওয়ার আশা করা যায়। অনুরূপ নফল নামাযের পর দুআ। আর আল্লাহই অধিক জানেন।

ফরয নামাযের পর হাত তুলে দুআ

প্রশ্ন ঃ- রসূল ﷺ থেকে বিশেষ করে ফরয নামাযের পর হাত তুলে দুআ করার কথা (হাদীসে) উল্লেখ হয়েছে কি? যেহেতু কিছু লোক আমাকে বলেছে যে, তিনি ﷺ ফরয নামাযের পর দুআর জন্য হাত উঠাতেন না।

উত্তর ঃ- নবী ﷺ হতে একথা শুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয় যে, তিনি ফরয নামাযের পর দুই হাত তুলতেন। অনুরূপ তাঁর সাহাবাবৃন্দ ؓ হতেও - আমাদের জানা মতে শুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়। আর কিছু লোক, যারা ফরয নামাযের পর হাত তুলে (দুআ করে) থাকে তা বিদ্‌আত; যার কোন ভিত্তি নেই। যেহেতু নবী ﷺ বলেন, "যে কোন এমন কাজ করে যার উপর আমাদের কোন নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত।" *(মুসলিম)* তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি আমাদের এ (দ্বীন) বিষয়ে কিছু এমন কর্ম উদ্ভাবন করবে যা ওর পর্যায়ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

(ফাতাওয়া কিতাবিদ দা'ওয়াহ, শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায ১/৭৪)

পরিজনকে নামায পড়তে আদেশ করলে এবং তারা নামায না পড়লে

প্রশ্নঃ- কোন ব্যক্তি তার পরিজনকে নামায পড়তে আদেশ করা সত্ত্বেও যদি তারা তার কথা না শোনে, তাহলে সে ব্যক্তি তাদের সহিত বসবাস করবে এবং মিলামিশা করবে নাকি গৃহ হতে বের (পৃথক) হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ- যদি ঐ ব্যক্তির পরিজনবর্গ আদৌ নামায না পড়ে, তবে তারা কাফের, মুরতাদ্দ্ এবং ইসলাম থেকে বহির্ভূত। আর ঐ ব্যক্তির সহিত একত্রে বাস করা বৈধ নয়। অবশ্য তার উপর ওয়াজেব যে, তাদেরকে দাওয়াত দেবে, বার বার উপদেশ দেবে এবং নামাযের জন্য পুনঃপুনঃ তাকীদ করবে। সম্ভবতঃ আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত করবেন। যেহেতু নামায ত্যাগকারী কাফের।

আল্লাহ আমাদেরকে পানাহ দিন। কিতাব, সুন্নাহ, সাহাবাবর্গের বাণী এবং সুচিন্তিত অভিমত থেকে এই বিধানের স্বপক্ষে দলীল বর্তমান।

কুরআন করীম থেকে দলীল, আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের প্রসঙ্গে বলেন,

(فَإِنْ تَابُوْا وَأَقَامُوْا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ)

অর্থাৎ, অতঃপর তারা যদি তওবা করে, যথাযথ নামায পড়ে ও যাকাত দেয় তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই। *(সূরা তাওবা ১১ আয়াত)*

উক্ত আয়াতের মর্মার্থ এই যে, তারা যদি উল্লিখিত কর্মাদি না করে, তাহলে তোমাদের ভাই নয়। আর ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন কোন পাপের কারণে বিনষ্ট হয় না। যদিও সে পাপ বড় হয়ে থাকে; কিন্তু ইসলাম থেকে বহির্গত হওয়ার সময় সে বন্ধন টুটে যায়।

সুন্নাহ থেকে দলীল; মহানবী ﷺ বলেন, "মানুষ এবং কুফর ও শির্কের মাঝে (অন্তরাল) নামায ত্যাগ।" *(মুসলিম ৮২নং)* সুনান গ্রন্থসমূহে বুরাইদাহ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে তিনি আরো বলেন, "আমাদের মাঝে ও ওদের মাঝে চুক্তিই হল নামায। যে ব্যক্তি তা পরিত্যাগ করে সে কাফের।" *(তিরমিযী ২৬২১নং, ইবনে মাজাহ ১০৭৯নং, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।)*

সাহাবাবর্গের বাণী থেকে দলীল; মুমিনগণের নেতা উমর ؓ বলেন, "যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করে তার জন্য ইসলামে কোন অংশ নেই।" কোন অংশ শব্দটি অনির্দিষ্টভাবে নেতিবাচক বাক্যগঠনে ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ হবে সাধারণ। অর্থাৎ 'না সামান্য অংশ, না অধিক।'

আব্দুল্লাহ বিন শাক্বীক্ব বলেন, 'নবী ﷺ -এর সাহাবাবৃন্দ নামায ছাড়া অন্য কোন আমল ত্যাগ করাকে কুফরী মনে করতেন না।'

সুচিন্তিত অভিমত প্রসঙ্গে বলা যায় যে, এটা কি জ্ঞানে ধরার কথা যে, যে ব্যক্তির অন্তরে সরষে দানা বরাবর ঈমান আছে, যে নামাযের মাহাত্ম্যকে জানে

এবং এর প্রতি আল্লাহর দেওয়া গুরুত্বকে চিনে তার পরও সে তা ত্যাগ করার উপর অবিচল থাকে? এমন হওয়া অসম্ভব।

যাঁরা বলেন, নামাযত্যাগী কাফের নয় তাঁদের দলীলসমূহকে ভেবে-চিন্তে দেখে তা চারটি কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ পেয়েছি।

১। ঐ সমস্ত দলীলপঞ্জীতে মুলতঃ এ কথার কোন দলীলই নেই। (অর্থাৎ ঐগুলি আলোচ্য বিষয়ের গ্রহণযোগ্য দলীল নয়।)

২। অথবা ঐ দলীল সমূহ এমন গুণে সীমাবদ্ধ যার সাথে নামায ত্যাগ করা অসম্ভব।

৩। অথবা ঐ দলীলসমূহ এমন অবস্থায় সীমাবদ্ধ যে অবস্থায় এই নামাযত্যাগীর কোন ওযর থাকে।

৪। অথবা ঐগুলি অনির্দিষ্ট, যা নামাযত্যাগীর কুফরের হাদীসসমূহ দ্বারা নির্দিষ্ট করা হবে।

যখন এ কথা স্পষ্ট যে, নামায ত্যাগকারী কাফের তখন এর উপর কিছু বিধান সন্নিবিষ্ট রয়েছে;

প্রথমত ঃ- মুসলিম (নামাযী) নারীর সহিত বেনামাযীর বিবাহ শুদ্ধ হবে না। নামায না পড়া অবস্থায় যদি তার বিবাহ বন্ধন হয়ে থাকে, তবে বিবাহ বাতিল পরিগণিত হবে এবং স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না। যেহেতু আল্লাহ তাআলা মুহাজির মহিলাদের প্রসঙ্গে বলেন,

(فَإِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوْهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَهُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ)

অর্থাৎ, “যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা বিশ্বাসিনী (মুমিন মহিলা) তবে তাদেরকে কাফেরদের নিকট ফিরিয়ে দিও না। মুমিন মহিলাগণ কাফের পুরুষদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফের পুরুষরাও মুমিন মহিলাদের জন্য বৈধ নয়।” *(সূরা মুমতাহেনা ১০আয়াত)*

আবার বিবাহ বন্ধনের পর যদি নামায ত্যাগ করে তবে সে বন্ধনও টুটে

যাবে এবং তার জন্য স্ত্রী বৈধ হবে না। এর দলীল পূর্বোক্ত আয়াত।

দ্বিতীয়ত ঃ- এই বেনামাযী ব্যক্তি যদি পশু যবেহ করে, তাহলে তার ঐ যবেহকৃত পশুর মাংস খাওয়া যাবে না। কেন? কারণ তা হারাম। অথচ তা যদি কোন ইয়াহুদী অথবা খ্রিষ্টান যবেহ করে, তাহলে তাদের যবেহকৃত পশুর মাংস আমাদের জন্য খাওয়া হালাল। সুতরাং ইয়াহুদী বা খ্রিষ্টান অপেক্ষা (নামধারী মুসলিম) বেনামাযীর যবেহকৃত পশুর মাংস নিকৃষ্টতর। আল্লাহ আমাদেরকে পানাহ দিন।

তৃতীয়তঃ- বেনামাযীর জন্য মক্কা মুকার্রামায় বা তার হারামের সীমার মধ্যে প্রবেশ করা অবৈধ। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوْا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذا﴾

অর্থাৎ-"হে ঈমানদারগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র, সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হয়।" *(সূরা তওবা ২৮ আয়াত)*

চতুর্থতঃ- যদি তার কোন (নামাযী) নিকটাত্মীয় মারা যায়, তবে তার মীরাসে (ত্যক্ত সম্পত্তিতে) এর কোন হক বা অধিকার নেই। সুতরাং কোন নামাযী বাপ যদি বেনামাযী ছেলে এবং এক দূরের নামাযী চাচাতো ভাই রেখে মারা যায়, তাহলে ঐ নামাযী লোকটির ওয়ারেস কে হবে? ঐ দূরের চাচাতো ভাই তার ওয়ারেস হবে, তার নিজের ছেলে নয়। যেহেতু উসামা ﷺ-এর বর্ণিত হাদীসে মহানবী ﷺ বলেন, "মুসলিম কাফেরের এবং কাফের মুসলিমের ওয়ারেস হবে না।" *(বুখারী ৬৭৬৪নং, মুসলিম ১৬১৪নং)*

পঞ্চমতঃ- বেনামাযী মারা গেলে তাকে গোসল দেওয়া এবং কাফন পরানো হবে না, তার উপর জানাযার নামায পড়া হবে না এবং মুসলমানদের কবরস্থানে তাকে দাফন করাও হবে না।

তাহলে আমরা তাকে কি করব ?

তাকে মরুভূমিতে (ময়দানে) নিয়ে গিয়ে একটি গর্ত খুঁড়ে তার পরিহিত কাপড়েই পুঁতে ফেলব। যেহেতু তার কোন সম্মান নেই। একথার উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে,যদি কারো নিকটে কেউ মারা যায় এবং সে জানে যে মৃত ব্যক্তি নামায পড়ত না তাহলে তার জানাযার নামায পড়ার জন্য ঐ লাশকে মুসলমানদের সামনে পেশ করা তার পক্ষে বৈধ নয়।

ষষ্ঠতঃ- কিয়ামতের দিন বেনামাযীর হাশর ফিরআউন, হামান, কারুন, উবাই বিন খলফ প্রভৃতি কুফরের নেতৃবর্গের সাথে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে পানাহ দিন। সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এবং তার কোন আত্মীয়র পক্ষে তার জন্য রহমত ও মাগফিরাতের দুআ করা বৈধ হবে না। যেহেতু সে কাফের এবং সে রহমত ও মাগফিরাতের হকদার নয়।

অতএব হে ভ্রাতৃবৃন্দ! সমস্যা বড় বিপজ্জনক। কিন্তু আফশোস! এতদ্‌সত্ত্বেও কিছু লোক এ বিষয়ে অবহেলা করে এবং বেনামাযীকে গৃহে স্থান দিয়ে থাকে! অথচ তা বৈধ নয়।

আর আল্লাহই অধিক জানেন। আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর বংশধর ও সমস্ত সাহাবাবৃন্দের উপর করুণা ও শান্তি বর্ষণ করুন।

(আসইলাতুম মুহিম্মাহ, ইবনে উসাইমীন ১১পৃঃ)

বেনামাযীর রোযা

প্রশ্ন ঃ- মুসলমানদের কিছু ওলামা সেই মুসলিমের নিন্দাবাদ করেন যে রোযা রাখে এবং (অন্য মাসে ৫ অক্ত) নামায পড়ে না। কিন্তু রোযার উপর নামাযের প্রভাব কি ? আমার ইচ্ছা যে রোযা রেখে (জান্নাতের) 'রাইয়ান' গেটে প্রবেশকারীদের সঙ্গে প্রবেশ করব। আর এ কথাও বিদিত যে, 'এক রমযান থেকে অপর রমযান মধ্যবর্তী সকল গোনাহকে ক্ষালন করে দেয়।' এ বিষয়ে আলোকপাত কামনা করি। আল্লাহ আপনাকে তওফীক দিন।

উত্তর ঃ- যাঁরা তোমার নিন্দা করেছেন যে, তুমি রোযা রাখ অথচ নামায পড়না- তাঁরা তোমার নিন্দাবাদে সত্যাশ্রয়ী। যেহেতু নামায ইসলামের খুঁটি, যা ব্যতিরেকে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। পরন্তু বেনামাযী কাফের ও ইসলামের মিল্লত থেকে বহির্ভূত। আর কাফেরের নিকট থেকে আল্লাহ রোযা, সাদকা, হজ্জ এবং অন্যান্য কোনও নেক আমল কবুল করেন না। যেহেতু আল্লাহ পাক বলেন,

﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللهِ وَبِرَسُوْلِهِ وَلاَ يَأْتُوْنَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالى وَلاَ يُنْفِقُوْنَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُوْنَ﴾

“ওদের অর্থ-সাহায্য গৃহীত হতে কোন বাধা ছিল না। তবে বাধা এই ছিল যে, ওরা আল্লাহ ও তদীয় রসূলকে অস্বীকার (কুফরী) করে এবং নামাযে আলস্যের সঙ্গে উপস্থিত হয়। আর অনিচ্ছাকৃতভাবে অর্থদান করে।” *(সূরা তাওবা ৫৪ আয়াত)*

সুতরাং এই কথার উপর ভিত্তি করে - যদি তুমি রোযা রাখ এবং নামায না পড় তাহলে- তোমাকে আমরা বলি যে, তোমার রোযা বাতিল ও অশুদ্ধ। আল্লাহর নিকট তা কোন উপকারে আসবে না এবং তা তোমাকে আল্লাহর সান্নিধ্য দান করতেও পারবে না। আর তোমার অমূলক ধারণা যে,‘এক রমযান থেকে অপর রমযান মধ্যবর্তী সকল গোনাহকে ক্ষালন করে দেয়’- তো এর জওয়াবে বলি যে, তুমি এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসটাই জানতে (বা বুঝতে) পারনি। রসূল ﷺ বলেন, “পাঁচ ওয়াক্ত নামায, জুমআহ থেকে জুমআহ এবং রমযান থেকে রমযান; এর মধ্যবর্তী সকল গোনাহকে ক্ষালন করে দেয়- যতক্ষণ পর্যন্ত কাবীরা গোনাহসমূহ থেকে দূরে থাকা হয়।” সুতরাং রমযান থেকে রমযান এর মধ্যবর্তী পাপসমূহ ক্ষালিত হওয়ার জন্য মহানবী ﷺ শর্তারোপ করেছেন যে, কাবীরা গোনাহসমূহ থেকে দূরে থাকতে হবে।কিন্তু তুমি তো নামায পড়না, আর রোযা রাখ। যাতে তুমি কাবীরা গোনাহ থেকে দূরে

থাক না। যেহেতু নামায ত্যাগ করার চেয়ে অধিক বড় কাবীরা গোনাহর কাজ আর কি আছে? বরং নামায ত্যাগ করা তো কুফ্র। তাহলে কি করে সম্ভব যে, রোযা তোমার পাপক্ষালন করবে?

সুতরাং তোমার প্রভুর প্রতি তোমাকে তওবা (অনুশোচনার সাথে প্রত্যাবর্তন) করা ওয়াজেব। আল্লাহ যে তোমার উপর নামায ফরয করেছেন তা পালন করে তার পর রোযা রাখা উচিত। এই জন্যই নবী ﷺ মুআয ﷺ-কে যখন ইয়ামান প্রেরণ করেন, তখন তাঁকে বলেছিলেন, "ওদেরকে তোমার প্রথম দাওয়াত যেন 'আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর রসূল'- এই সাক্ষ্যদানের প্রতি হয়। যদি ওরা তা তোমার নিকট থেকে গ্রহণ করে তবে তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ ওদের উপর প্রত্যেক দিবা-রাত্রে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন।

অতএব দুই সাক্ষ্যদানের পর নামায, অতঃপর যাকাত দিয়ে (দাওয়াত) শুরু করেছেন।

(লিখেছেন- মুহাম্মদ বিন সালেহ আল উসাইমীন।)

রোগী কিভাবে নামায পড়বে?

১। ফরয নামায রোগীর জন্যও দাঁড়িয়ে পড়া ওয়াজেব - যদিও ঝুঁকে বা প্রয়োজন মনে করলে দেওয়াল কিংবা লাঠির উপর ভর করে হয়।

২। যদি খাড়া হতে সক্ষম না হয়, তাহলে বসে নামায পড়বে। কিয়াম ও রুকুর অবস্থায় চারজানু হয়ে বসাই উত্তম।

৩। যদি বসেও নামায না পড়তে পারে, তাহলে পার্শ্বদেশে (করোট হয়ে) শয়ন করে নামায পড়বে। কেবলার দিকে সম্মুখ করবে। ডান পার্শ্বে শয়ন করেই নামায পড়া উত্তম। যদি কেবলা মুখ করতে সক্ষম না হয়, তাহলে যেদিকে তার সম্মুখ থাকে, সে দিকেই মুখ করে নামায পড়বে। এতে তার নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং পুনরায় পড়তে হবে না।

৪। যদি পার্শ্বদেশে শয়ন করেও নামায পড়তে অক্ষম হয়, তাহলে চিৎ হয়ে নামায পড়বে এবং তার পা দুটিকে কেবলার দিকে রাখবে। অবশ্য কেবলা মুখ করার জন্য মাথাটা একটু উঁচু করে নেওয়া উত্তম। যদি পা দুটিকে কেবলার দিকে না ফিরাতে পারে, তাহলে যে অবস্থায় থাকে ঐ অবস্থাতেই নামায পড়বে এবং আর পুনরায় পড়তে হবে না।

৫। নামাযে রুকু সিজদা করা রোগীর জন্যও ওয়াজেব। যদি তা করতে সক্ষম না হয়, তাহলে ঐ সময় মাথা হিলিয়ে ইশারা করবে। রুকু অপেক্ষা সিজদার সময় মাথাকে অধিক নিচু করবে। যদি সিজদা ছাড়া রুকু করতে সক্ষম হয়, তাহলে রুকুর সময় রুকু করবে এবং সিজদার সময় ইশারা করবে। পক্ষান্তরে যদি রুকু ছাড়া সিজদা করতে সক্ষম হয়, তাহলে সিজদার সময় সিজদা এবং রুকুর সময় ইশারা করবে।

৬। রুকু ও সিজদার সময় যদি মাথা হিলিয়ে ইশারা করতেও অক্ষম হয়, তাহলে দুই চক্ষু দ্বারা ইশারা করবে। রুকুর সময় অল্প খানিক চক্ষু নিমীলিত করবে এবং সিজদার সময় অধিক উত্তমরূপে চক্ষু মুদ্রিত করবে। কিন্তু আঙ্গুল দ্বারা ইশারা -যা কিছু রোগী করে থাকে -তা শুদ্ধ নয় এবং কিতাব, সুন্নাহ অথবা আহলে ইলমদের বাণী থেকে এ কথার কোন ভিত্তি আমি জানি না।

৭। যদি মাথা হিলিয়ে এবং চক্ষু দ্বারাতেও ইশারা করতে অক্ষম হয়, তাহলে মনে মনে নামায পড়বে। তকবীর বলবে, সূরা পাঠ করবে এবং অন্তরে রুকু, সিজদা, কিয়াম ও বৈঠকের নিয়ত (মনে মনে কল্পনা) করবে। আর প্রত্যেক মানুষের তাই (প্রাপ্য) হয় যার সে নিয়ত করে থাকে।

৮। প্রত্যেক নামায তার যথা সময়ে পড়া রোগীর জন্যও ওয়াজেব। যতটা করতে সক্ষম নামাযের ততটা ওয়াজেব (যথা নিয়মে) পালন করবে। যদি যথা সময়ে প্রত্যেক নামায পড়তে কষ্ট হয়, তাহলে সে যোহর ও আসরকে এবং মাগরিব ও এশাকে একই সময়ে জমা করে পড়তে পারে। আসরকে যোহরের সাথে আগিয়ে এবং এশাকে মাগরিবের সাথে আগিয়ে জমা তাকদীম (অগ্রিম

জমা) করবে। নতুবা যোহরকে আসরের সাথে পিছিয়ে এবং মাগরিবকে এশার সাথে পিছিয়ে জমা তা'খীর (পশ্চাৎ জমা) করবে। যেমন তার জন্য সুবিধা ও সহজ হবে তেমনিভাবে নামায জমা করে আদায় করবে। অবশ্য ফজরের নামাযকে অগ্র-পশ্চাতের কোন নামাযের সহিত জমা করা যাবে না।

৯। রোগী যদি অন্য শহরে চিকিৎসা করাতে মুসাফির হয় তাহলে (কষ্ট না হলেও) চার রাকআত বিশিষ্ট নামায কসর (সংক্ষেপ) করে পড়বে। সুতরাং যোহর আসর ও এশার নামায দু-দু রাকআত করে পড়বে। এইরূপ ততদিন করবে যতদিন নিজের শহরে ফিরে না এসেছে- চাহে তার সফরের সময়কাল দীর্ঘ হোক অথবা সংকীর্ণ। ([1])

(শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উসাইমীন)

যাকাত ত্যাগকারীর প্রসঙ্গে বিধান

প্রশ্ন ঃ- যাকাত ত্যাগকারীর বিধান কি ? অস্বীকার করে অথবা কার্পণ্য করে অথবা অবহেলা করে যাকাত ত্যাগকারীর মাঝে কি কোন পার্থক্য আছে ?

উত্তর ঃ- *বিসমিল্লা-হির রাহমা-নির রাহীম।*

যাকাত ত্যাগকারীর বিধান বলতে গেলে বিশদ বর্ণনার দরকার; সুতরাং যাকাতের সকল শর্ত বর্তমান থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ তা ওয়াজেব হওয়াকে

([1]) *অবশ্য উক্ত বিধি তখনই প্রযোজ্য যখন সে ঐ শহরে গিয়ে স্থায়ী না হবে। পক্ষান্তরে যদি সে সেখানে স্থায়ী হয়ে যায়, শীত-তাপ নিয়ন্ত্রিত গৃহে বসবাস শুরু করে, অন্যান্য স্থায়ী বাসিন্দাদের মত বিলাস-সামগ্রী ব্যবহার করে, শহরবাসীর (স্বগৃহে বসবাসের) মত নিজের বাসায় স্থিরতা লাভ করে তাহলে সে মুসাফির নয়। (অতএব নামায কসর না করে পূর্ণ করেই পড়বে।) বিশেষ করে যদি তার অবস্থান চার দিনের অধিক হয়। কারণ সে তো এ সফরে আরাম ও বিলাসপরায়ণ জীবন উপভোগ করে থাকে এবং সফরের সেই কষ্ট থেকেও দূরে থাকে যাকে আযাবের একটি টুকরা বলা হয়েছে। (শায়খ আব্দুল্লাহ বিন জিবরীন)*

অস্বীকার করে, তাহলে যাকাত দিলেও সর্ববাদিসম্মতিক্রমেই সে কাফের হয়ে যাবে। যতক্ষণ না সে তা ওয়াজেব হওয়াকে স্বীকার করেছে।

পক্ষান্তরে যদি কেউ কার্পণ্য অথবা অবহেলা করে যাকাত প্রদান না করে, তবে সে এমন ফাসেক বলে গণ্য হবে, যে বড় কাবীরা গোনাহর শিকার হয়েছে। এমন ব্যক্তি মারা গেলে (ক্ষমা ও শাস্তির ব্যাপারে) আল্লাহর ইচ্ছাধীন থাকবে। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তার সহিত অংশী করার গোনাহ ক্ষমা করবেন না এবং এছাড়া অন্যান্য গোনাহকে যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন। *(সূরা নিসা ৪৮ আয়াত)*

পবিত্র কুরআন এবং প্রসিদ্ধ সুন্নাহ হতে একথা জানা যায় যে, যাকাত ত্যাগকারীকে কিয়ামতের দিন তার সেই সকল মাল-ধনের মাধ্যমে আযাব দেওয়া হবে যার যাকাত সে আদায় করেনি। অতঃপর তাকে জান্নাত অথবা জাহান্নামের পথ দেখানো হবে। আর এই শাস্তির ধমক সেই ব্যক্তির জন্য যে যাকাতকে ওয়াজেব বলে অস্বীকার করে না। আল্লাহ তাআলা সূরা তাওবায় *(৩৪-৩৫ আয়াতে)* বলেন,

(يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّ كَثِيْراً مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ، يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ)

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! পন্ডিত ও সংসারবিরাগীদের মধ্যে অনেকে লোকের ধন অন্যায়ভাবে ভোগ করে থাকে এবং লোককে আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত

করে। যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে এবং আল্লাহর পথে তা ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তির সংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে সেসব উত্তপ্ত করা হবে এবং তদ্দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে (এবং বলা হবে,) এ তো সেই (ধন) যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করে রেখেছিলে। সুতরাং যা পুঞ্জীভূত করে রাখতে তার আস্বাদন গ্রহণ কর।

সোনা-চাঁদির যাকাত যারা প্রদান করে না তাদের প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন যা ঘোষণা করেছে ঠিক তাই বলা হয়েছে নবী ﷺ-এর সহীহ হাদীসসমূহে। যেমন যে ব্যক্তি চতুস্পদ জন্তুর; উঁট, গরু, ভেঁড়া ও ছাগলের যাকাত আদায় করে না তার শাস্তির কথাও হাদীসে এভাবে ব্যক্ত হয়েছে যে, ঐ সমস্ত জন্তু দিয়েই তাকে আযাব ভোগ করানো হবে।

আর যারা টাকা-পয়সার যাকাত প্রদান করে না, তাদের প্রসঙ্গে বিধানও ওদের মত যারা সোনা-রূপার যাকাত আদায় করে না; কারণ টাকা-পয়সা সোনা-রূপার বিকল্প ও স্থলাভিষিক্ত।

পরন্তু যারা যাকাত ওয়াজেব হওয়াকেই অস্বীকার করে তাদের ব্যাপারে বিধান অন্যান্য কাফেরদের ব্যাপারে যে বিধান আছে ঠিক তারই অনুরূপ; ওদের সকলকে একই সঙ্গে জাহান্নামের দিকে জমায়েত করা হবে এবং অন্য সকল কাফেরদের ন্যায় তাদের আযাবও জাহান্নামে চিরকালের জন্য নিরবচ্ছিন্ন থাকবে।

আল্লাহ তাআলা ওদের এবং ওদের মত অন্যান্য কাফেরদের প্রসঙ্গে বলেন,

(وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا كَذٰلِكَ يُرِيْهُمُ اللهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنَ النَّارِ)

অর্থাৎ, এবং যারা (ভ্রষ্ট নেতাদের)অনুসরণ করেছিল তারা বলবে, হায়! যদি একটিবার (পৃথিবীতে) ফিরে যাবার সুযোগ আমাদের ঘটত, তবে আমরাও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম যেমন তারা আমাদের সাথে ছিন্ন করল!’

এভাবে আল্লাহ তাদের কার্যাবলীকে তাদের পরিতাপরূপে দেখাবেন। আর তারা কখনও আগুন হতে বের হতে পারবে না। *(সূরা বাক্বারাহ ১৬৭আয়াত)*

সূরা মায়েদাহ *(৩৭ আয়াতে)* তিনি বলেন,

(يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ)

অর্থাৎ, তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে কিন্তু তারা বের হতে পারবে না, আর তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী আযাব।

কিতাব ও সুন্নাহতে এ বিষয়ে আরো অন্যান্য বহু দলীল রয়েছে।

(ফাতাওয়া মুহিম্মাহ তাতাআল্লাকু বিয্যাকাত, শায়খ ইবনে বায, ৫-৭ পৃঃ)

আল্লাহ আরশের উপরে

প্রশ্ন ঃ- যারা বলে 'আল্লাহ সব জায়গায় আছেন'-(আল্লাহ এর থেকে উর্ধ্বে) তাদের কথা কি ভাবে খন্ডন করব ? যারা এই কথা বলে তাদের সম্বন্ধে শরীয়তের সিদ্ধান্ত কি ?

উত্তর ঃ- আহলে সুন্নাহ অল জামাআতের আকীদা ও বিশ্বাস এই যে, আল্লাহ তাআলা সসত্তায় আরশের উপর আছেন। তিনি বিশ্বজগতের ভিতরে নন, বরং বিশ্বজগতের উর্ধ্বে, তা হতে ভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন। অথচ তিনি প্রত্যেক জিনিসের অবস্থা সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবীতে কোনও গুপ্ত জিনিস তাঁর নিকট গোপন নেই। তিনি বলেন,

(إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ)

অর্থাৎ, তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন অতঃপর তিনি আরশের উপর আরূঢ় হন। *(সূরা ইউনুস ৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, (الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى)

অর্থাৎ, দয়াময় আরশে আছেন। *(সূরা ত্বাহা ৫ আয়াত)* এবং তিনি বলেন,

(ثُمَّ اسْتوى عَلَى الْعَرْشِ، الرَّحْمن فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيْراً)

অর্থাৎ, অতঃপর তিনি আরশের উপর হন। তিনি দয়াময়, তাঁর সম্বন্ধে যে অবগত আছে তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখ। *(সূরা ফুরক্বান ৫৯ আয়াত)*

আর তিনি যে সারা সৃষ্টির ঊর্ধ্বে আছেন তার দলীল এও যে তাঁর নিকট হতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। আর অবতরণ ঊর্ধ্ব থেকে নিম্নের দিকেই হয়; যেমন তিনি বলেন,

(وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ)

অর্থাৎ, এবং এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি----। *(সূরা মা-য়েদাহ ৪৮ আয়াত)*

আর এ ছাড়া আরো অন্যান্য আয়াত রয়েছে, যা এই কথাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাআলা সকল সৃষ্টি জগতের ঊর্ধ্বে।

মুআবিয়া বিন হাকাম সুলামীর হাদীসে বর্ণিত তিনি বলেন, উহুদ ও জাওয়ানিয়্যাহর মধ্যবর্তী জায়গায় আমার কিছু ছাগল ছিল, যার দেখাশোনা করত আমারই এক ক্রীতদাসী। একদা সে পাল ছেড়ে দিলে অকস্মাৎ এক নেকড়ে এসে একটি ছাগল নিয়ে চম্পট দেয়। আমি আদম সন্তানের অন্যতম মানুষ; মনস্তাপ ও ক্রোধে দাসীকে চপেটাঘাত করলাম। অতঃপর নবী ﷺ-এর নিকট এসে সে কথার উল্লেখ করলে তিনি তা আমার জন্য বড় গুরুতর মনে করলেন। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি ওকে মুক্ত করে দেব না কি?' তিনি বললেন, "ওকে ডাকো।" আমি ওকে ডেকে আনলে তিনি ওকে প্রশ্ন করলেন, "আল্লাহ কোথায়?" দাসীটি বলল, 'আকাশে।' তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, "আমি কে?" সে বলল, 'আপনি আল্লাহর রসূল।' তিনি বললেন, "ওকে মুক্ত করে দাও; যেহেতু ও মুমিন নারী।" *(মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ প্রভৃতি)*

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবু সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা কি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না অথচ আমি তাঁর নিকট বিশ্বস্ত যিনি আকাশে আছেন। সকাল-সন্ধ্যায় আমার নিকট আকাশের খবর আসে।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ সব জায়গায় আছেন, সে সর্বেশ্বরবাদীদের অন্যতম। আল্লাহ সকল সৃষ্টির ঊর্ধ্বে আছেন, তিনি তাঁর সকল সৃষ্টি হতে পৃথক থেকে আরশে আছেন।-এই সত্যের প্রতি নির্দেশকারী দলীলাদি দ্বারা তার কথা খন্ডন করা হবে। অতএব যদি সে কিতাব, সুন্নাহ ও ইজমা' (সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত)র অনুসারী হয়, তাহলে সে মুসলিম। নচেৎ সে কাফের এবং ইসলামের গন্ডি হতে বহির্ভূত।

সংক্ষেপিত (লাজনাহ দা-য়েমাহ, মাজাল্লাতুল বহুসিল ইসলা-মিয়্যাহ ২০/ ১৬৮পৃঃ)

আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম করা

প্রশ্নঃ- আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্যের নামে কসম বা হলফ করা বৈধ কি? পরন্তু নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি এক ব্যক্তির ব্যাপারে বলেছেন, "যদি ও সত্য বলেছে, তাহলে ওর বাপের কসম ও পরিত্রাণ পেয়ে যাবে।"

উত্তরঃ- আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম বা শপথ করা; যেমন 'তোমার হায়াতের বা আমার হায়াতের কসম, অথবা মহামান্য নেতা বা জাতির কসম' ইত্যাদি সবই হারাম। বরং এমন কসম করা শির্কের পর্যায়ভুক্ত। কারণ কসম করায় রয়েছে তা'যীম। আর এমন প্রকার তা'যীম আল্লাহ জাল্লা শানুহু ছাড়া আর কারো জন্য উপযুক্ত নয়। আর যে তা'যীম কেবল আল্লাহরই জন্য সঙ্গত সেই তা'যীম দ্বারা অপর কাউকে তা'যীম প্রদর্শন করা শির্ক। কিন্তু শপথকারী যখন এই বিশ্বাস রাখে না যে, 'যার নামে সে শপথ করছে তার মহত্ব আল্লাহর মহত্বের মত', তখন তার ঐ কসম শির্কে আকবর হবে না। বরং তা শির্কে

আসগর হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম বা শপথ করে সে ছোট শির্ক করে।

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা তোমাদের আব্বার নামে কসম খেয়ো না। যে ব্যক্তির কসম খাওয়ার দরকার হবে সে যেন আল্লাহর নামেই খায়, নচেৎ চুপ থাকে।"

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করে সে শির্ক করে।" সুতরাং খবরদার! আপনি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম করবেন না। যদিও আপনি যার নামে কসম করছেন তিনি নবী ﷺ হন, অথবা জিবরীল বা অন্যান্য কোন রসূল, ফিরিশ্তা কিংবা মানুষ হন। যাইবা হোক, আপনি আল্লাহ ছাড়া আর কোন কিছুর নামে কসম করবেন না।

বাকী থাকল নবী ﷺ-এর উক্তি - তো 'বাপের কসম' শব্দটির ব্যাপারে হাদীসের হাফেযগণ মতভেদ করেছেন। অনেকে ঐ শব্দটিকে অস্বীকার করে বলেন, 'ঐ শব্দটি নবী ﷺ থেকে শুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়।' অতএব যদি তাই হয় তাহলে এ ব্যাপারে আর কোন জটিলতা অবশিষ্ট থাকে না। যেহেতু পরস্পর-বিরোধী অপর উক্তিতে প্রথম উক্তির বিরোধ থাকলে জরুরী এই যে, অপর উক্তি শুদ্ধ ও প্রমাণিত হতে হবে। পক্ষান্তরে বিরোধী উক্তি যদি শুদ্ধ প্রমাণিত না হয়, তাহলে তা প্রথম উক্তির মুকাবেলার যোগ্যই হয় না এবং তার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করা হয় না। অবশ্য যাঁরা বলেন, 'উক্ত উক্তি (বাপের কসম) শুদ্ধ প্রমাণিত' তাঁদের কথা অনুসারে এই জটিলতার জওয়াব এই যে, উক্ত হাদীস জটিল ও দুর্বোধ্য। পক্ষান্তরে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে হাদীসটি স্পষ্ট ও বোধগম্য। সুতরাং আমাদের নিকট দুটি উক্তি রয়েছে; একটি সুস্পষ্ট ও বোধগম্য। অপরটি অস্পষ্ট ও জটিলতা-পূর্ণ। আর সুবিজ্ঞ ব্যক্তিদের নীতি এই যে, তাঁরা অস্পষ্ট ও জটিলতাপূর্ণ উক্তি বর্জন করে সুস্পষ্ট ও বোধগম্য উক্তিকে গ্রহণ করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

(هُوَ الَّذِيْ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَات، فَأَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيْلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ إِلاَّ اللهُ، وَالرَّاسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا)

অর্থাৎ- তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যার কিছু আয়াত সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন, এগুলি কিতাবের মূল অংশ; আর অন্যগুলি অস্পষ্ট অবোধ-গম্য। যাদের মনে কুটিলতা আছে তারা ফিতনা সৃষ্টির ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা অবোধগম্য তার অনুসরণ করে। বস্তুতঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা সুবিজ্ঞ তারা বলে, আমরা এ বিশ্বাস করি। সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে আগত। *(সূরা আ-লি ইমরান ৭ আয়াত)*

উক্ত হাদীসে ঐ উক্তি (বাপের কসম) জটিলতাপূর্ণ অস্পষ্ট এই জন্য বলছি যে, যেহেতু তাতে রয়েছে একাধিক ব্যাখ্যার সম্ভাবনা। হতে পারে ঐ উক্তি তিনি করেছেন আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যের নামে শপথ নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে। হতে পারে এরকম বলার বৈধতা রসূল ﷺ-এর জন্য খাস। (অর্থাৎ ঐরূপ তিনিই বলতে পারেন, আর অন্য কেউ পারে না।) কারণ তাঁর ব্যাপারে শির্কের কল্পনা অসম্ভব। আবার হতে পারে ঐ উক্তি সেই সব কথার পর্যায়ভুক্ত যা অনিচ্ছাকৃতভাবে কথার মাত্রা হিসাবে মুখ থেকে বের হয়ে পড়ে। অতএব উক্ত উক্তির ব্যাপারে যখন এত ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে তখন রসূল ﷺ হতে তা সহীহভাবে প্রমাণিত হলেও আমাদের জন্য আবশ্যক এই যে, আমরা সুস্পষ্ট ও জটিলতাহীন উক্তির উপর আমল করব। আর তা হল এই যে, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম খাওয়া নিষিদ্ধ।

অবশ্য অনেকে একথাও বলতে পারে যে, 'আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম অভ্যাসগতভাবে আমার মুখ থেকে বের হয়ে থাকে যা বর্জন করা দুষ্কর।' তবে তার উত্তর কি?

এর উত্তরে আমরা বলি যে, এটা কোন দলীল নয়। বরং আপনি ঐরূপ কসম ত্যাগ করার এবং ঐ অভ্যাস থেকে ফিরে আসার লক্ষ্যে আপনার আত্মার বিরুদ্ধে জিহাদ করুন। আমার মনে পড়ে, আমার সাথে কোন ব্যাপারে কথা বলতে বলতে এক ব্যক্তিকে নবীর নামে কসম খেতে শুনলে আমি তাঁকে নিষেধ করলাম। সে তখন চট্ করে বলে উঠল, 'নবীর কসম! আর দ্বিতীয়বার ঐরূপ কসম খাব না!' অথচ সে একথা ঐরূপ কসম পুনঃ না খাওয়ার উপর নিশ্চয়তাদানের ভিত্তিতেই বলেছিল। কিন্তু অভ্যাস এমন জিনিস যে, তার মুখ থেকে সেই কসমই পুনরায় বের হল।

তাই বলি যে, এইরূপ কসমের শব্দ আপনার জিভ থেকে মুছে ফেলার জন্য আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করুন। কারণ তা শির্ক! আর শির্কের বিপত্তি বড় ভয়ানক -যদিও তা ছোট হয়। এমন কি শায়খুল ইসলাম ইবনে ত্যাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, শির্কের অপরাধ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না, যদিও তা ছোট শির্ক হয়।

ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, 'আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে সত্য কসম খাওয়ার চেয়ে আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম খাওয়া আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।'

শাইখুল ইসলাম বলেন, 'তা এই কারণে যে (অন্যের নামে সত্য কসম খাওয়া হলেও তা শির্ক এবং আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম খাওয়া কাবীরাহ (গোনাহ)। আর কাবীরাহ গোনাহর চেয়ে শির্কের গোনাহ অধিক বড়।'

(ফতোয়া শায়খ ইবনে উসাইমীন ১/১৭৪)

আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে যবেহ শির্ক

প্রশ্নঃ- আওলিয়া ও সালেহীনদের কবরের নিকট খাসী যবেহ করে তাঁদের নৈকট্যলাভের আশা করা আমাদের বংশে আজও প্রচলিত। আমি তাদেরকে বহুবার নিষেধ করেছি কিন্তু তারা প্রত্যেকবারেই আমার কথা ঔদ্ধত্যের সাথে প্রত্যাখ্যান করেছে। আমি তাদেরকে বলেছি, 'এমন করা আল্লাহর সাথে শির্ক করা হয়।' কিন্তু বলেছে, আমরা তো আল্লাহর যথাযথ ইবাদত করে থাকি। তবে তাঁর আওলিয়ার কবর যিয়ারত করলে, আমাদের ফরিয়াদে 'তোমার অমুক নেক ওলীর দোহাই (অসীলায়) আমাদেরকে রোগ মুক্ত কর, অথবা অমুক বিপদ দূর কর' বললাম তো তাতে দোষ কি? আমি বলেছি, 'আমাদের দ্বীন কোন মাধ্যম বা অসীলার দ্বীন নয়।' তারা জবাবে বলেছে, 'আমাদেরকে আমাদের নিজের অবস্থায় ছেড়ে দাও।'

এখন আমার প্রশ্ন হল, ওদেরকে সৎপথে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে কি উপায় আছে বলে আপনি মনে করেন? আমি ওদের জন্য কি করতে পারি ? আমি কিরূপে বিদআতের বিরুদ্ধে লড়তে পারি? উত্তর দেবেন। ধন্যবাদ।

উত্তরঃ- কিতাব ও সুন্নাহ থেকে দলীলের ভিত্তিতে একথা বিদিত যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন আওলিয়া, জিন, মূর্তি, প্রভৃতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যবেহ করা শির্কের অন্তর্ভুক্ত এবং তা জাহেলিয়াত ও মুশরেকদের কর্ম। আল্লাহ তাআলা বলেন,

(قُلْ إِنَّ صَلاَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ)

অর্থাৎ- বল, নিশ্চয় আমার নামায, আমার কুরবানী (যবেহ) আমার জীবন ও আমার মুত্যু একমাত্র সেই আল্লাহ বিশ্বজাহানের প্রতিপালকেরই জন্য। তাঁর কোন অংশী নেই। আর আমি এ ব্যাপারেই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)। *(সূরা আন আম ১৬২- ১৬৩ আয়াত)*

উক্ত আয়াতে 'নুসুক' শব্দের অর্থ হল 'যবেহ'। আল্লাহ সুবহানাহু এখানে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে যবেহ করা শির্ক, যেমন তিনি ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে নামায পড়া শির্ক।

তিনি আরো বলেন,

(إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি তোমাকে কওসর (হওয) দান করেছি। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায পড় এবং কুরবানী কর। *(সূরা কাউসার ১-২ আয়াত)*

উক্ত সূরা শরীফে আল্লাহ সুবহানাহু তাঁর নবীকে আদেশ করেন যে, তিনি যেন তাঁর উদ্দেশ্যে নামায পড়েন এবং তাঁরই উদ্দেশ্যে কুরবানী ও যবেহ করেন। আর এতে তিনি সেই মুশরিকদের বিপরীত ও বিরোধ করেন যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে সিজদা ও যবেহ করত।

তিনি অন্যত্র বলেন, **(وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوْا إِلاَّ إِيَّاهُ)**

অর্থাৎ, আর তোমার প্রতিপালক এই ফায়সালা ও আদেশ করেছেন যে তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত কর---। *(সূরা বানী ইসরাঈল ২৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, **(وَمَا أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ)**

অর্থাৎ, তারা তো কেবল আল্লাহরই আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্তে হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁরই ইবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছিল। *(সূরা বাইয়িনাহ ৫ আয়াত)*

আর এই অর্থে আরো বহু আয়াত রয়েছে। পরন্তু 'যবেহ করা' একটি ইবাদত। যা বিশুদ্ধচিত্তে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই নিবেদিত।

সহীহ মুসলিমে আমীরুল মুমিনীন আলী বিন আবী তালেব ﵁ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে অভিশাপ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে যবেহ করে।" (প্রকাশ যে, মেহমানকে খাওয়ানোর জন্য কিছু যবেহ করা এর পর্যায়ভুক্ত নয়।)

পক্ষান্তরে বক্তার 'আমি আল্লাহর নিকট তাঁর আওলিয়ার অসীলায় বা তাঁর আওলিয়ার মর্যাদার অসীলায় অথবা নবীর অসীলায় বা নবীর মর্যাদার অসীলায় প্রার্থনা করছি' বলা শির্ক নয়। বরং অধিকাংশ উলামাগণের নিকট তা বিদআত এবং শির্কের অসীলা। কেননা, দুআ বা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা হল এক প্রকার ইবাদত; যার পদ্ধতি দলীল-সাপেক্ষ। অথচ আমাদের নবী ﷺ হতে এমন কোন দলীল প্রমাণিত নেই, যা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কারো ব্যক্তিত্ব বা মর্যাদার অসীলায় দুআ করার বৈধতার প্রতি ইঙ্গিত করে। সুতরাং আল্লাহ যা বিধিবদ্ধ করেননি সেই অসীলা নবরূপে উদ্ভাবন করে (তার মাধ্যমে) দুআ করা মুসলিমের জন্য জায়েয নয়। তিনি বলেন,

(أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوْا لَهُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ)

অর্থাৎ, তাদের কি এমন কতকগুলো অংশীদার (উপাস্য আছে যারা তাদেরকে এমন দ্বীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেন নি! *(সূরা শূরা ২১ আয়াত)*

আর নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমাদের এ (দ্বীন) বিষয়ে নতুন কিছু উদ্ভাবন করে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয় তবে তা প্রত্যাখ্যাত।" *(বুখারীও মুসলিম)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যা বুখারী বিনা সনদে প্রত্যয়ের সাথে তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, "যে ব্যক্তি এমন কোন কর্ম করে যার প্রতি আমাদের কোন নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত।" আর 'প্রত্যাখ্যাত' মানে তা ঐ ব্যক্তির নিকট থেকে গ্রহণ করা ও মেনে নেওয়া হবে না।

অতএব প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ওয়াজেব হল, আল্লাহ যা বিধিবদ্ধ করেছেন নিয়মনিষ্ঠ হয়ে কেবল তারই অনুসরণ করা এবং লোকেদের নব উদ্ভাবিত বিদআতসমূহ হতে সাবধান ও দূরে থাকা। পরন্তু বিধেয় অসীলাও রয়েছে শরীয়তে (যার অসীলায় দুআ করা যায়)। আর তা হল আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর অসীলা, তাঁর একত্ববাদের অসীলা, নেক আমলের অসীলা, আল্লাহ

ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমানের অসীলা, আল্লাহ ও তদীয় রসূলের প্রতি মহব্বতের অসীলা এবং অনুরূপ আরো অন্যান্য নেক ও সৎকর্মের অসীলা। পরিশেষে আমরা আল্লাহর নিকট তওফীক চাই, তিনিই তওফীকদাতা।

(কিতাবুদ্দা'ওয়াহ ১৬)

দর্গায় উৎসর্গীকৃত-পশুর মাংস

প্রশ্ন ঃ- কোন দর্গায় বা মাযারে উরস ইত্যাদিতে উৎসর্গীকৃত; গায়রুল্লাহর নামে বা তার তুষ্টিবিধানের উদ্দেশ্যে যবেহকৃত পশুর মাংস যে খায় সে মুশরিক কি? নাকি সে হারাম ভক্ষণকারী পাপী ?

উত্তর ঃ- আল্লাহ ভিন্ন অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত পশু এবং আল্লাহ ভিন্ন অন্যের নাম নিয়ে অথবা আল্লাহর নাম না নিয়েই যবেহকৃত পশুর মাংস খাওয়া হারাম। যেমন সেই সমস্ত যবেহকৃত পশু, যার দ্বারা মাযার ও দর্গাপূজারীরা কবরবাসীর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের আশা করে থাকে, তার মাংসও ভক্ষণ করা অবৈধ। যেহেতু তা মৃত পশুর মাংসের অনুরূপ। তবে যে ব্যক্তি শরীয়তের নির্দেশ না জেনে বা অবহেলায় তা ভক্ষণ করে এবং খাওয়া হালাল মনে না করে, তবে সে কাফের হয়ে যাবে না।

(লাজনাহ দা-য়েমাহ, মাজাল্লাতুল বহূসিল ইসলামিয়্যাহ, ২৬/১০৯)

কবরযুক্ত মসজিদে নামায

প্রশ্ন ঃ- কোন মসজিদের ভিতর কবর থাকলে তাতে নামায পড়া বৈধ কি ?

উত্তর ঃ- মসজিদের ভিতর হতে কবর খুঁড়ে মৃতব্যক্তির অস্থি ইত্যাদি বের করে মুসলিমদের সাধারণ কবরস্থানে দাফন করা ওয়াজেব। যে মসজিদে কবর আছে সে মসজিদে নামায পড়া বৈধ নয়।

(লাজনাহ দা-য়েমাহ, মাজাল্লাতুল বহূসিল ইসলামিয়্যাহ ২০/১৭৫)

কবর দ্বারা তাবার্রুক গ্রহণ করা, তা কেন্দ্র করে তওয়াফ করা এবং গায়রুল্লাহর নামে শপথ করা কি?

প্রশ্ন ঃ মহামান্য শায়খ মুহাম্মদ বিন সালেহ আলউসাইমীন (হাফেযাহুল্লাহ)!

আসসালামু আলাইকুম অরাহমাতুল্লা-হি অবারাকা-তুহ।

কবর দ্বারা তাবার্রুক গ্রহণ করা, কোন প্রয়োজন মিটানো বা সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে কবরের চতুর্পার্শ্বে তওয়াফ করা কি? তদনুরূপ গায়রুল্লাহর নামে শপথ করা কি? যেমন, "নবীর কসম, তোমার জীবনের কসম, আমার আভিজাত্যের শপথ, সম্পদের শপথ" ইত্যাদি? আবার এ ধরনের শপথকারীকে নিষেধ করলে বলে, এটা আমাদের অনায়াসসিদ্ধ অভ্যাস। তাই আমরা এ বিষয়ে আলোকপাত কামনা করি। আল্লাহ আমাদের ও মুসলিমদের তরফ থেকে আপনাকে নেক বদলা দান করুন। অসসালা-মু আলাইকুম অ রাহমাতুল্লা-হি অ বারাকা-তুহ।

উত্তর ঃ অ আলাইকুমুস সালা-মু অ রাহমাতুল্লা-হি অ বারাকা-তুহ ।

কবর দ্বারা তাবার্রুক গ্রহণ হারাম এবং এক প্রকার শির্ক। যেহেতু এতে এমন বস্তুর প্রভাব সাব্যস্ত করা হয় যে সম্পর্কে আল্লাহ কোন দলীল অবতীর্ণ করেননি। সলফে সালেহীনেরও এ ধরনের তাবার্রুক নেওয়ার আচরণ ছিল না। অতএব এই দিক দিয়ে তা বিদআত বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি তাবার্রুক গ্রহণকারী এই বিশ্বাস রাখে যে, কবরবাসীর কোন প্রভাব-ক্ষমতা আছে, অথবা অনিষ্ট নিবারণের কিংবা ইষ্ট দানের কোন শক্তি আছে এবং তাকে এ উদ্দেশ্যেই আহ্বান করে, তাহলে তা শির্কে আকবর বা বৃহত্তম শির্ক হবে। তদনুরূপ

কবরবাসীর তা'যীম ও সামীপ্য লাভের উদ্দেশ্যে রুকু সিজদা অথবা যবেহ দ্বারা তার জন্য ইবাদত করলেও শির্কে আকবর হয়। আল্লাহ তাআ-লা বলেন,

(وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهاً آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الكَافِرُوْنَ)

অর্থাৎ-যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে অন্য উপাস্যকে আহ্বান করে যার নিকটে এ বিষয়ে কোন সনদ নেই; তার হিসাব তার প্রতিপালকের নিকট আছে নিশ্চয় কাফেরদল সফলকাম হবে না। *(সূরা মুমেনুন ১১৭আয়াত)* তিনি আরো বলেন,

(فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً)

অর্থাৎ-যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকেও শরীক না করে। *(সূরা কাহ্ফ ১১০আয়াত)* আর শির্কে আকবরের মুশরিক কাফের। সে চিরস্থায়ী জাহান্নামবাসী হবে এবং জান্নাত তার জন্য হারাম হবে। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন,

(إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ ، وَمَأْوَاهُ النَّار وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَار)

অর্থাৎ, অবশ্যই যে কেহ আল্লাহর অংশী করবে নিশ্চয় আল্লাহ তার জন্য বেহেশ্ত্ হারাম করবেন ও তার বাসস্থান হবে দোযখ। আর অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। *(সূরা মা-য়েদাহ ৭২আয়াত)*

গায়রুল্লাহর নামে শপথ; যদি শপথকারী যার নামে শপথ করে তার জন্য এই বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ তাআলার মর্যাদার মত তারও মর্যাদা আছে, তাহলে সে শির্ক আকবরের মুশরিক। যদি সেই বিশ্বাস না থাকে বরং তার অন্তরে যার নামে শপথ করছে তার প্রতি তা'যীম থাকে যার কারণে সে তার নামে শপথ করতে উদ্বুদ্ধ হয় এবং আল্লাহর মর্যাদার ন্যায় তারও মর্যাদা আছে-এ কথা

বিশ্বাস না রাখে, তাহলে সে ছোট শির্কের মুশরিক। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "যে গায়রুল্লাহর নামে শপথ করে সে কুফরী করে অথবা শির্ক করে।"

যে কেউ কবর দ্বারা তাবার্রুক গ্রহণ করে, কবরবাসীকে আহ্বান করে অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম খায় তাকে বাধা দেওয়া ওয়াজেব এবং স্পষ্ট করে বুঝানো উচিত যে, এসব তাকে আল্লাহর শাস্তি থেকে নিস্তার দেবে না। পক্ষান্তরে শপথকারীর এই কথা যে, 'এটা আমাদের অনায়াসসিদ্ধ অভ্যাস।' তো এই দলীলই হল মুশরিকদের দলীল যারা রসূলগণকে মিথ্যা মনে করেছে। তারা বলেছে,

(إنّا وَجَدْنَآ آبَآءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُوْنَ)

অর্থাৎ, 'আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এক মতাদর্শের অনুসারী পেয়েছি এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্কানুসারী।' *(সূরা যুখরুফ২৩আয়াত)* যখন রাসূল তাদেরকে বলেছিলেন,

(قَالَ أَوَ لَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْ تُمْ عَلَيْهِ آبَآءكُمْ، قَالُوْا إنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُوْنَ)

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষগণকে যার অনুসারী পেয়েছ আমি যদি তোমাদের জন্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথ-নির্দেশ আনয়ন করি তবুও কি তোমরা তাদের পদাঙ্কানুসরণ করবে? প্রত্যুত্তরে তারা বলত, তোমরা যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। *(সূরা যুখরুফ২৪ আয়াত)* আল্লাহ বলেন,

(فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ)

অর্থাৎ, অতঃপর ওদের নিকট থেকে আমি প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম। দেখ, মিথ্যাচারীদের পরিণাম কেমন ছিল? *(সূরা যুখরুফ ২৫আয়াত)*

কারো জন্য তার বাতিলের উপর এই বলে দলীল ধরা বৈধ নয় যে, সে তার পূর্বপুরুষদের ঐ রূপ করতে দেখেছে, অথবা এটা তার অভ্যাস- ইত্যাদি। যদি

এ ধরনের কোন দলীল কেউ মেনেও থাকে তবে আল্লাহ তাআলার নিকট তা অসার ও ব্যর্থ। তা কোন লাভও দেবে না এবং কোন উপকারেও আসবে না। তাই যারা অনুরূপ ব্যাধিগ্রস্ত তাদের উচিত, আল্লাহর প্রতি তওবা (প্রত্যাবর্তন) করা এবং সত্যের অনুসরণ করা - তাতে তা যেখানেই হোক, যার নিকট থেকেই হোক এবং যখনই হোক। সত্য গ্রহণ করতে যেন নিজ সম্প্রদায়ের আচরণ ও অভ্যাস অথবা জনসাধারণের ভর্ৎসনা তাকে প্রতিহত না করে। কারণ, প্রকৃত মুমেন সেই যে আল্লাহর ওয়াস্তে কোন তিরস্কারকে গ্রাহ্য করে না এবং আল্লাহর দ্বীন থেকে কোন প্রতিবন্ধক তাকে বাধা দিতে পারে না।

আল্লাহ যা পছন্দ করেন তা করতে তিনি সকলকে প্রেরণা দান করুন এবং যাতে তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি আছে তা থেকে রক্ষা করুন। (আমীন)

লিখেছেন মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উসাইমীন। ১৩/ ১০/ ১৪১২হিঃ

কবরের উপর লিখা কি?

প্রশ্ন ঃ- কবরের উপর লিখা অথবা বিভিন্ন রং দ্বারা চিহ্নিত করা কি ?

উত্তর ঃ- রং করা চুনকাম করারই অন্তর্ভুক্ত। আর মহানবী ﷺ কবর চুনকাম করতে নিষেধ করেছেন। তদনুরূপ এই (রং করা) মানুষের পরস্পর গর্ববোধ করার অসীলাও বটে; যাতে কবরসমূহ গর্বপ্রকাশ করার স্থানে পরিণত হবে। সুতরাং তার থেকে দূরে থাকাই উচিত।

আর কবরের উপর কিছু লিখার কথা ; তো মহানবী ﷺ লিখতে নিষেধ করেছেন। অবশ্য কিছু ওলামা এ ব্যাপারে সহজ করেছেন, যদি লিখা কেবল চিহ্ন রাখার জন্য হয়। যাতে মৃতব্যক্তির কোন প্রশংসাদি না হয়। আর নিষেধের হাদীসকে সেই অবস্থার উপর নির্দিষ্ট করেছেন, যে অবস্থায় কবরবাসীর

তা'যীমের উদ্দেশ্যে লিখা হয়। আর এর দলীলে বলেছেন যে, কবরের উপর লিখা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটা কবরের চুনকাম ও তার উপর ইমারত বানানো নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারের অনুরূপ। ([2])

(সাবউনা সুয়ালান ফী আহকা-মিল জানা-ইয, মুহাম্মাদ আল-উসাইমীন।)

নবীদিবস পালন করা যাবে কি?

প্রশ্ন ঃ- ১২ই রবীউল আওয়াল নবী ﷺ-এর পবিত্র জন্মদিন উপলক্ষে ঈদের মত দিনে ছুটি না মানিয়ে রাতে মসজিদে সমবেত হয়ে তাঁর পবিত্র জীবন-চরিত আলোচনা করা মুসলিমদের জন্য বৈধ কি? আমরা এতে মতভেদে পড়েছি। কেউ বলে বিদ্‌আতে হাসানাহ, আবার কেউ বলে, গায়র হাসানাহ?

উত্তর ঃ- ১২ই রবীউল আওয়াল বা অন্য কোন রাতে নবী ﷺ এর জন্মদিন উপলক্ষে সমবেত হয়ে নবী দিবস পালন করা মুসলিমদের জন্য বৈধ নয়। যেমন তিনি ছাড়া অন্য কারো জন্মদিন পালন করাও তাদের জন্য বৈধ নয়। যেহেতু জন্মদিন পালন দ্বীনে অভিনব বিদ্‌আতসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কেননা নবী ﷺ তাঁর জীবনে নিজের জন্মদিন পালন করেননি, অথচ তিনি দ্বীনের মুবাল্লিগ ও প্রচারক এবং মহান প্রতিপালকের নিকট থেকে অনুশাসন প্রতিষ্ঠাতা। এ ব্যাপারে তিনি কোন নির্দেশও দেননি। তাঁর পর তাঁর খোলাফায়ে রাশেদীন, তাঁর সমস্ত সাহাবাবর্গ এবং স্বর্ণযুগের নিষ্ঠাবান তাবেয়ীনবৃন্দও তা পালন করে যাননি। যাতে প্রতীয়মান হয় যে, তা বিদআত। রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমাদের এ ব্যাপারে (দ্বীনে) কোন কিছু অভিনব রচনা করল যা

([2]) *সুনান আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে যে,নবী ﷺ ইবনে মাযউন ﷺএর কবরের উপর একটি পাথর রাখলেন এবং বললেন, "আমি এর দ্বারা আমার ভায়ের কবর চিনতে পারব এবং আমার পরিবারের মৃতদেহকে তার পাশেই দাফন করব।"-ইবনে জিবরীন*

এর অন্তর্ভুক্ত নয় তা রহিত (বাতিল)।" *(বুখারী ও মুসলিম)* 'মুসলিম'এর এক বর্ণনায় আছে যা ইমাম বুখারী বিনা সনদে প্রত্যয়ের সাথে বর্ণনা করেছেন, তিনি ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি এমন কোন কর্ম করে যাতে আমাদের কোন নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত।"

জন্মদিবস পালন করার ব্যাপারে মহানবী ﷺ -এর কোন নির্দেশ নেই বরং তা পরবর্তী যুগের লোকেরা ধর্মে নতুন ভাবে প্রক্ষিপ্ত করেছে; যা বাতিল বলে গণ্য হবে। মহানবী ﷺ জুমআর দিন খুতবায় বলতেন,"অতঃপর নিশ্চয় উত্তম বাণী আল্লাহর গ্রন্থ এবং উত্তম পথ-নির্দেশ মুহাম্মাদ ﷺ -এর পথ-নির্দেশ। সব চেয়ে মন্দ কর্ম ওর অভিনব রচিত কর্মসমূহ। এবং প্রত্যেক নব কর্মই বিদআত, আর প্রত্যেক বিদআত্ই ভ্রষ্টতা।" এ হাদীসটিকে ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসাঈও হাদীসটিকে উত্তম সনদ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। যাতে এ কথাটিকেও অতিরিক্ত করা হয়েছে, "এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতার স্থান দোযখে।" পক্ষান্তরে মসজিদ ও মাদ্রাসা ইত্যাদিতে রসূল আলাইহিস সালাতু অসসালামের জীবন-চরিত এবং জাহেলিয়াত ও ইসলামে তাঁর জীবনেতিহাস সম্পৃক্ত পাঠাবলীর সহিত তাঁর জন্ম-সংক্রান্ত হাদীস ইত্যাদি প্রশিক্ষণ তাঁর জন্ম দিবস পালনের অভাব পূরণ করবে। যাতে নতুন ভাবে কোন এমন অনুষ্ঠান পালনের প্রয়োজন থাকবে না, যা আল্লাহ বা তাঁর রসূল বিধিবদ্ধ করেননি এবং যার প্রমাণে কোন শরয়ী দলীলও বর্তমান নেই।

আল্লাহই সাহায্যস্থল। আল্লাহর নিকট আমরা সকল মুসলমানের জন্য সুন্নাহর উপর যথেষ্ট করার এবং বিদআত থেকে বাঁচার হেদায়াত ও তওফীক প্রার্থনা করি। *(ফাতাওয়া কিতাবিদ দা'ওয়াহ, ইবনে বায ১/২৪০)*

জায়েয ও নাজায়েয ঝাড়-ফুঁক

প্রশ্নঃ- আমাদের দেশে কিছু লোক আছেন যাঁরা (পীর, হুজুর, মৌলানা বা ওস্তাজী) নামে পরিচিত তাঁরা কোন ব্যক্তি রোগ-পীড়িত বা জাদুগ্রস্ত অথবা

জিন-আক্রান্ত ইত্যাদি হলে তাবীয আদি লিখে চিকিৎসা করে থাকেন। সুতরাং ঐ ধরনের মানুষদের কাছে যে চিকিৎসা করায় এবং তাঁদের ঐ চিকিৎসা সম্বন্ধে শরীয়তের নির্দেশ কি ?

উত্তরঃ- যাদু-গ্রস্ত অথবা অন্যপ্রকার রোগীকে ঝাড়-ফুঁক করা কোন দূষনীয় কাজ নয়; যদি ঝাড়-ফুঁকের মন্ত্র কুরআন বা বিধেয় দুআ থেকে হয় । কেননা, হাদীস শরীফে প্রমাণিত যে, নবী ﷺ সাহাবাগণকে ঝাড়-ফুঁক করতেন। তিনি যে সব দুআ ইত্যাদি দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করতেন তার একটি দুআ নিম্নরূপঃ-

ربنا الله الذى فى السماء تقدس اسمك، أمرك فى السماء والأرض، كما رحمتك فى السماء فاجعل رحمتك فى الأرض، أنزل رحمة من رحمتك واشف من شفائك على هذا الوجع فيبرأ،

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ! যিনি আসমানে আছেন। তোমার নাম অতি পবিত্র। তোমার কর্তৃত্ব আসমানে ও পৃথিবীতে। তোমার রহমত যেমন আসমানে আছে তেমনি পৃথিবীতেও তোমার রহমত বিতরণ কর। তোমার রহমত হতে একটি রহমত বর্ষণ কর এবং তোমার আরোগ্যদান হতে এই ব্যথ্যার উপর আরোগ্য দাও, যাতে তা ভালো হয়ে যায়। *(আহমাদ, আবূ দাঊদ ৩৮৯২নং, আলবানী হাদীসটিকে যয়ীফ বলে চিহ্নিত করেছেন)*

বিধেয় ঝাড়-ফুঁকের দুআসমূহের একটি নিম্নরূপঃ-

بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُّؤْذِيْكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ، اَللهُ يَشْفِيْكَ، بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ.

উচ্চারণঃ- বিসমিল্লা-হি আরক্বীক, মিন কুল্লি শাইয়িন ইউ'যীক, অমিন শার্রি কুল্লি নাফসিন আউ আইনি হা-সিদ, আল্লা-হু য়্যাশফীক, বিসমিল্লা-হি আরক্বীক।

অর্থ- আমি তোমাকে আল্লাহর নাম নিয়ে প্রত্যেক কষ্টদায়ক বস্তু থেকে এবং প্রত্যেক আত্মা অথবা বদনজরের অনিষ্ট থেকে মুক্তি পেতে ঝাড়ছি। আল্লাহ

তোমাকে আরোগ্য দান করুন। আল্লাহর নাম নিয়ে তোমাকে ঝাড়ছি। *(মুসলিম, তিরমিযী)*

বিধেয় ঝাড়-ফুঁকের আরো একটি এই যে, বেদনাহত ব্যক্তি তার বেদনা স্থলে হাত রেখে (৩ বার 'বিসমিল্লাহ' বলে ৭বার) নিম্নের দুআ পাঠ করবেঃ-

أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ.

উচ্চারণঃ- আঊযু বিইয্যাতিল্লা-হি অকুদরাতিহী মিন শার্রি মা আজিদু অউহা-যির।

অর্থ- আমি আল্লাহর মর্যাদা ও কুদরতের অসীলায় সেই জিনিসের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাচ্ছি যা আমি পাচ্ছি ও ভয় করছি। *(মুসলিম ২২০২ নং, আবু দাঊদ ৪/১১)*

এ ছাড়া আরো অন্যান্য দুআ আছে যা উলামাগণ রসূল ﷺ হতে বর্ণিত হাদীসসমূহ থেকে উল্লেখ করেছেন।

পক্ষান্তরে আয়াত ও দুআ লিখে (হাতে, কোমরে বা গলায়) লটকানোর বৈধতা ও অবৈধতার ব্যাপারে উলামাগণের মাঝে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, বৈধ। আবার অনেকে বলেন, তা অবৈধ। তবে সঠিক ও বলিষ্ঠ মতে তা অবৈধ ও না জায়েয। কারণ, এরূপ চিকিৎসা-পদ্ধতি নবী ﷺ হতে বর্ণিত হয়নি। কেবল বর্ণিত হয়েছে ঝাড়-ফুঁক করার কথা। পক্ষান্তরে আয়াত বা দুআ লিখে রোগীর গলায় বা হাতে লটকানো অথবা বালিশের নিচে রাখা ইত্যাদির কথা সঠিক রায় মতে নিষিদ্ধ। কেন না, এমন চিকিৎসা-প্রণালী হাদীসে উল্লেখ হয়নি। আর যে ব্যক্তি শরীয়তের অনুমোদন ছাড়া কোনও বিষয়কে অন্য এক বিষয়ের হেতু বানায় সে ব্যক্তির এ কাজ এক প্রকার শির্ক হিসাবে পরিগণিত। কারণ, এতে সেই বস্তুকে (তাবীয ও কবচকে রোগ-বালা দূর করার) হেতু বানানো হয় যাকে আল্লাহ হেতু রূপে অনুমোদন করেননি।

অবশ্য এসব কিছু ঐ সমস্ত পীর, মৌলানা বা ওস্তাযীদের কথা দৃষ্টিচ্যুত করে বলা হল। পরন্তু জানি না, ওঁরা হয়তো ঐ ফকীরী বা দৈবচিকিৎসকদের শ্রেণীভুক্ত যারা অবৈধ ও হারাম (বাক্য বা শব্দ; যেমন ফিরিশ্তা, শয়তান,

নক্‌শে সুলাইমানী, অবোধগম্য শব্দ প্রভৃতি) লিখে তাবীয বানিয়ে থাকে। এরূপ তাবীয লিখা ও ব্যবহার করা হারাম হওয়াতে তো কোন সন্দেহই নেই। এ জন্যই কিছু উলামা বলেছেন, 'ঝাড়-ফুঁকে দোষ নেই। তবে শর্ত হল, তা যেন অর্থবোধক ও শির্কহীন হয়।' *(ফতোয়া শায়খ ইবনে উসাইমীন ১/১৩৯)*

দৈব চিকিৎসকের নিকট চিকিৎসা

প্রশ্নঃ- এক শ্রেণীর মানুষ যারা- তাদের কথানুযায়ী- দেশীয় চিকিৎসা দ্বারা চিকিৎসা করে। আমি যখন তাদের একজনের নিকট গেলাম তখন সে আমাকে বলল, 'তোমার নাম ও তোমার মায়ের নাম লিখ এবং আগামীকাল ফিরে এস।' অতঃপর ঐ ব্যক্তি যখন তাদের নিকট পুনরায় ফিরে আসে তখন তারা তাকে বলে, 'তোমার অমুক রোগ হয়েছে বা এই দোষ হয়েছে এবং তোমার চিকিৎসা এই বা ঐ।' ওদের একজন বলছে, ও নাকি চিকিৎসায় আল্লাহর কালাম ব্যবহার করে। সুতরাং ওদের মত চিকিৎসক প্রসঙ্গে আপনার অভিমত কি? এবং চিকিৎসার জন্য ওদের নিকট যাওয়া বৈধ হবে কি ?

উত্তর ঃ- যে চিকিৎসক তার চিকিৎসায় এরূপ করে থাকে তা এ কথারই প্রমাণ যে, সে জিন ব্যবহার করে এবং গায়বী খবর রাখার দাবী করে। সুতরাং তার নিকট চিকিৎসা করানো বৈধ নয়। যেমন তার নিকট যাওয়া, তাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করাও অবৈধ। যেহেতু এই শ্রেণীর মানুষের জন্য মহানবী ﷺ বলেন,"যে ব্যক্তি কোন গণকের নিকট এসে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে, তার চল্লিশ রাত নামায কবুল করা হয় না।" *(মুসলিম)*

গণক, দৈবজ্ঞ ও যাদুকরের নিকট যেতে, তাদেরকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে এবং তাদের ঐ কথাকে সত্যায়ন বা বিশ্বাস করতে নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে মহানবী ﷺ থেকে একাধিক হাদীস শুদ্ধভাবে প্রমাণিত আছে। তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি গণকের কাছে আসে এবং সে যা বলে তা সত্য বলে মানে

তবে সে মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি অবতীর্ণ বিষয় (কুরআনের) সাথে কুফরী করে (অস্বীকার করে)।"

সুতরাং যে ব্যক্তি পাথর মেরে, কড়ি খেলে, মাটিতে দাগ টেনে অথবা রোগীকে তার ও তার মায়ের নাম অথবা কোন আত্মীয়র নাম জিজ্ঞাসা করে গায়বী (অদৃশ্য) জ্ঞানের দাবী করে তবে এসব এই কথারই দলীল যে, সে গণক ও দৈবজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত। যাদেরকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে এবং তাদের কথা সত্যায়ন করতে মহানবী ﷺ নিষেধ করেছেন। অতএব ওদের থেকে এবং কোন গায়বী খবর জানতে ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা থেকে; বরং ওদের নিকট চিকিৎসা করানো থেকে সাবধান হওয়া ওয়াজিব। যদিও তারা মনে করে যে, ওরা কুরআন দ্বারা চিকিৎসা করে। যেহেতু প্রকৃতত্ব গোপন করা ও প্রতারণা করা বাতিলপন্থীদের আচরণ, তাই ওরা যা বলে তাতে ওদেরকে সত্যবাদী জানা বৈধ নয়। আর যে ব্যক্তি ঐ ধরনের কোন মানুষের খবর জানতে পারবে তার জন্য ওয়াজেব, সে যেন ওর খবর কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করে। কাযী, আমীর এবং প্রত্যেক শহরে সৎকার্যে আদেশ ও অসৎকার্যে বাধা দানের কেন্দ্রে অভিযোগ করে। যাতে তাদের উপর আল্লাহর ফায়সালা কার্যকরী করা হয় এবং মুসলমানরা ওদের অনিষ্ট, বিঘ্ন ও ওদের অসদুপায়ে পরের মাল ভক্ষণ করার হাত থেকে নিরাপত্তা লাভ করতে পারে। আর আল্লাহই সাহায্যস্থল। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া পাপ থেকে প্রত্যাবর্তন এবং সৎকার্যে মনোনিবেশ করার ক্ষমতা কারো নেই।

(ফাতা-ওয়া কিতা-বিদ দা'ওয়াহ, ইবনে বায -- ১/ ২২পৃঃ)

ধর্মভীরুদের প্রতি বিদ্রূপ হানা

প্রশ্ন ঃ- আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আজ্ঞাবহ ধার্মিকদের প্রতি বিদ্রূপ হানা কি?

উত্তর ঃ- আল্লাহ ও তদীয় রসূলের আজ্ঞাবহ ধর্মভীরুকে ধর্মের যথার্থ অনুগত হওয়ার কারণে বিদ্রূপ করা হারাম এবং তা মানুষের জন্য বড় বিপজ্জনক আচরণ। কারণ এ কথার আশঙ্কা থাকে যে, ধর্মভীরুদেরকে তার ঐ অবজ্ঞা তাদের আল্লাহর দ্বীনের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকাকে অবজ্ঞা করার ফল হতে পারে। তখন তাদেরকে ঠাট্টা-ব্যঙ্গ করার অর্থই হবে তাদের সেই পথ ও তরীকাকে ঠাট্ট্রা-ব্যঙ্গ করা- যার উপর তারা প্রতিষ্ঠিত। যাতে তারা ঐ লোকেদের অনুরূপ হবে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

(وَلَـئِنْ سَأَلـتَهُمْ لَـيَقُوْلَـنَّ إِنَّـمَا كُـنَّا نَـخُوْضُ وَنَــلْعَبُ، قُـلْ أَبِـاللهِ وَآيـاَتِـهِ وَرَسُوْلِـهِ كُنْتُمْ تَـسْتَهْزِئُـونَ، لاَ تَـعْتَذِرُوْا قَـدْ كَفَرْتُمْ بَـعْدَ إِيْمَانِـكُمْ إِنْ نَـعْفُ عَنْ طَآئِفَـةٍ مِـنْكُمْ نُـعَذِّبْ طَآئِفَـةً بِـأَنَّـهُمْ كَـانُـوا مُجْرِمِـيْنَ)

"এবং তুমি ওদের প্রশ্ন করলে ওরা নিশ্চয় বলবে, আমরা তো আলাপ আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক করছিলাম। বল, তোমরা কি আল্লাহ,তাঁর নিদর্শন ও রসূলকে নিয়ে বিদ্রূপ করছিলে? দোষ স্খালনের চেষ্টা করোনা, তোমরা তোমাদের ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গেছ।" *(সূরা তাওবাহ ৬৫-৬৬ আয়াত)*

উক্ত আয়াতটি মুনাফিকদের একটি গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়। যারা রসূল ﷺ এবং তাঁর সাহাবাবৃন্দকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল, 'আমরা আমাদের ঐ কারীদলের মত আর কাউকে অধিক পেটুক, মিথ্যুক এবং রণভীরু দেখিনি।' তখন আল্লাহ তাআলা তাদের জওয়াবে এই আয়াত কয়টি অবতীর্ণ করেছিলেন।

সুতরাং তাদেরকে সাবধান হওয়া উচিত যারা হকপন্থীদেরকে নিয়ে- তারা ধর্মভীরু বলে- ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে থাকে। যেহেতু আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন,

(إِنَّ الَّـذِيْنَ أَجْرَمُوْا كَانُـوْا مِنَ الَّـذِيْنَ آمَنُوْا يَـضْحَكُوْنَ، وَإِذَا مَرُّوْا بِـهِمْ يَـتَغَامَزُوْنَ، وَإِذَا انْـقَلَبُوْا إِلَى أَهْلِهِمُ انْـقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ، وَإِذَا رَأَوْهُمْ

قَالُوْآ إِنَّ هؤُلآءِ لَضَآلُّوْنَ، وَمَا أُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حَافِظِيْنَ، فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ، عَلَىَ الأَرَاءِكِ يَنْظُرُوْنَ، هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ)

"দুষ্কৃতকারীরা মুমিনদের উপহাস করত এবং যখন তাদের নিকট দিয়ে যেত তখন বক্রদৃষ্টিতে ইশারা করত। ওরা যখন ওদের আপনজনের নিকট ফিরে আসত তখন উৎফুল্ল হয়ে ফিরত, এবং যখন ওদের দেখত তখন বলত, নিশ্চয় ওরাই পথভ্রষ্ট। ওদেরকে তো তাদের তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠানো হয়নি। আজ বিশ্বাসী (মুমিন)গণ উপহাস করছে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী (কাফের) দলকে, সুসজ্জিত আসন হতে ওদেরকে অবলোকন করে। কাফেররা তাদের কৃতকার্যের প্রতিফল পেল তো?" *(সূরা মুত্বাফফিফীন/২৯-৩৬আয়াত)*

(আসইলাতুম মুহিম্মাহ, ইবনে উসাইমীন ৮পৃঃ)

অমুসলিমকে সালাম

প্রশ্ন ঃ- অমুসলিমদেরকে সালাম দেওয়া যায় কি?

উত্তর ঃ- অমুসলিমদেরকে প্রথমে সালাম দেওয়া হারাম, বৈধ নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন,"ইয়াহুদ ও নাসাদেরকে প্রথমে সালাম দিও না। ওদের সহিত পথে সাক্ষাৎ হলে সংকীর্ণতার প্রতি বাধ্য কর।" কিন্তু ওরা যদি আমাদেরকে প্রথমে সালাম দেয় তাহলে তার উত্তর দেওয়া আমাদের জন্য ওয়াজেব হবে। যেহেতু সাধারণ ভাবেই আল্লাহ বলেন,

(وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَآ)

অর্থাৎ- আর যখন তোমাদেরকে অভিবাদন করা হয়, তখন তোমরাও তা অপেক্ষা উত্তম অভিবাদন করবে অথবা ওরই অনুরূপ উত্তর দেবে। *(সূরা নিসা ৮৬)*

ইয়াহুদীরা মহানবী ﷺকে সালাম দিত, বলত, 'আস্‌সা-মু আলাইকা ইয়া মুহাম্মাদ! (তোমার উপর মৃত্যু বর্ষণ হোক, হে মুহাম্মদ!)' 'আস্‌সা-ম' এর অর্থ মৃত্যু। তারা রসূল ﷺকে মৃত্যুর বদ্দুআ দিত। তাই নবী ﷺ বললেন, "ইহুদীরা বলে, 'আস্‌সা-মু আলাইকুম।' সুতরাং ওরা যখন তোমাদেরকে সালাম দেবে তখন তোমরা তার উত্তরে বল,'অ আলাইকুম।"

অতএব কোন অমুসলিম যখন মুসলিমকে সালাম দিয়ে বলে, 'আস্‌সা-মু আলাইকুম,' তখন আমরা তার উত্তরে বলব,'অ আলাইকুম।' উপরন্তু তাঁর উক্তি 'অ আলাইকুম' এই কথার দলীল যে, যদি ওরা 'তোমাদের উপর সালাম' বলে, তাহলে তাদের উপরেও সালাম। সুতরাং ওরা যেমন বলবে আমরাও ওদেরকে তেমনি বলব। এই জন্য কতক উলামা বলেছেন যে, ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান বা অন্য কোন অমুসলিম যখন স্পষ্ট শব্দে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলবে তখন আমাদের জন্য 'অ আলাইকুমুস সালাম' বলে উত্তর দেওয়া বৈধ হবে।

অনুরূপভাবে অমুসলিমদেরকে প্রথমে স্বাগত জানানো, যেমন 'আহলান অ সাহলান (স্বাগতম, খোশ আমদেদ, ওয়েল কাম প্রভৃতি) বলাও বৈধ নয়। যেহেতু এতে তাদের সম্মান ও তা'যীম অভিব্যক্ত হয়। কিন্তু ওরা যখন প্রথমে আমাদেরকে ঐ বলে স্বাগত জানাবে তখন আমরাও তাদেরকে অনুরূপ বলে উত্তর দেব। যেহেতু ইসলাম ন্যায়পরায়ণতা এনেছে এবং প্রত্যেক অধিকারীকে তার অধিকার দিতে উদ্বুদ্ধ করেছে। আর এ কথা বিদিত যে, আল্লাহ আযযা অ জাল্লার নিকটে মুসলিমরাই সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা বড়। তাই প্রথমে অমুসলিমদেরকে সালাম দিয়ে নিজেদেরকে অপদস্থ করা উচিত নয়। অতএব উত্তরের সারমর্মে বলি যে, অমুসলিমকে প্রথমে সালাম দেওয়া বৈধ নয়। যেহেতু নবী ﷺ এ থেকে নিষেধ করেছেন এবং যেহেতু এতে মুসলিমের

লাঞ্ছনা আছে। কারণ সে এতে অমুসলিমকে প্রথমে তা'যীম ও সম্মান প্রদর্শন করে। অথচ আল্লাহর নিকট মুসলিমই সম্মানের দিক দিয়ে অধিক উচ্চ। তাই এতে নিজেকে অপমানিত করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে যখন ওরা আমাদেরকে সালাম দেবে তখন আমরা তাদের অনুরূপ সালামের উত্তর দেব। তদনুরূপ ওদেরকে প্রথমে স্বাগত জানানোও বৈধ নয়। যেমন, 'আহলান অ সাহলান, মারহাবা' ইত্যাদি বলা। কেননা এতেও ওদেরকে তা'যীম প্রদর্শন করা হয়। যা ওদেরকে প্রথমে সালাম দেওয়ারই অনুরূপ।

(ফাতাওয়া শায়খ ইবনে উসাইমীন, সঞ্চয়নে আশরফ আব্দুল মাকসুদ /২১০-২১১)

কাফেরদেরকে সাদর সম্ভাষণ ও মুবারকবাদ

মহামান্য শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উসাইমীন হাফেযাহুল্লাহ--

আসসালামু আলাইকুম অরাহমাতুল্লা-হি অবারাকাতুহ।

অতঃপর (জানতে চাই যে),

প্রশ্ন ঃ- ক্রিসমাস ডে ও নববর্ষের আগমনে কাফেরদেরকে মুবারকবাদ দেওয়া যায় কি? যেহেতু ওরা আমাদের সাথে কাজ করে। ওরা যদি আমাদেরকে সম্ভাষণ জানায় তাহলে ওদেরকে আমরা কি ভাবে উত্তর দেব? এই উপলক্ষে ওদের আয়োজিত কোন অনুষ্ঠানে যোগদান করা বৈধ কি? উক্ত বিষয়সমূহের কোন একটা করে ফেললে মানুষ গোনাহগার হবে কি? যদি সদ্ব্যবহার, চক্ষুলজ্জা বা সঙ্কোচ ইত্যাদির খাতিরে করা হয়? আর এ সবে ওদের অনুরূপ করা চলবে কি? এ বিষয়ে আমাদেরকে ফতোয়া দিন। আল্লাহ আপনাকে নেক বদলা দেবেন।

উত্তর ঃ- *অ আলাইকুমুস সালা-মু অ রাহমাতুল্লা-হি অ বারাকাতুহ।*

ক্রিসমাস ডে' অথবা অন্য কোন ওদের ধর্মীয় পর্ব ও খুশিতে কাফেরদেরকে মুবারকবাদ দেওয়া সর্ববাদিসম্মতিক্রমে অবৈধ। যেমন ইবনুল কাইয়েম রাহিমাহুল্লাহ তাঁর গ্রন্থ 'আহকা-মু আহলিয যিম্মাহ' তে নকল করেছেন।

তিনি বলেন,'বিশিষ্ট কুফরের প্রতীক ও নিদর্শনের ক্ষেত্রে মুবারকবাদ পেশ করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। যেমন ওদের ঈদ অথবা ব্রত উপলক্ষে মুবারকবাদ দিয়ে বলা, 'তোমার জন্য ঈদ মুবারক হোক', অথবা 'এই খুশিতে শুভাশীষ গ্রহণ কর' ইত্যাদি। এ কাজে যদিও সম্ভাষণদাতা কুফর থেকে বেঁচে যায়, তবুও তা হারামের অন্তর্ভুক্ত। আর এটা ওদের ক্রুশকে সিজদা করার উপলক্ষে মুবারকবাদ দেওয়ার অনুরূপ। বরং এটা আল্লাহর নিকট গোনাহ এবং গযবের দিক থেকে মদ্যপান খুন, ব্যভিচার ইত্যাদির উপর মুবারকবাদ দেওয়ার চেয়ে অধিক বড় ও বেশী। বহু মানুষই যাদের নিকট দ্বীনের কোন কদর নেই তারা উক্ত পাপে পতিত হয়ে থাকে। কৃতকর্মের কুফলকে জানতে পারে না। উপরন্তু কোন মানুষকে পাপ, বিদআত অথবা কুফরের উপর মুবারকবাদ জানিয়ে থাকে, যখন সে নিশ্চিতভাবে আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির শিকার হয়ে যায়। *(ইবনুল কাইয়েমের উক্তি সমাপ্ত)*

কাফেরদের ধর্মীয় ঈদ-পর্বে তাদেরকে মুবারকবাদ দেওয়া এই লক্ষ্যেই হারাম যা ইবনুল কাইয়েম উল্লেখ করেছেন। যেহেতু তাতে কুফরী প্রতীকের উপর কাফেরদের প্রতিষ্ঠিত থাকাকে স্বীকার ও সমর্থন করা হয় এবং তাদের জন্য তাতে সম্মতি প্রকাশ করা হয়। যদিও সে এই কুফরী নিজের জন্য পছন্দ করেনা কিন্তু তবুও মুসলিমের জন্য কুফরীর প্রতীকে সম্মতি প্রকাশ অথবা তার উপর কাউকে মুবারকবাদ জানানো বৈধ নয়। কারণ আল্লাহ তাআলা ওতে সম্মত নন। যেমন তিনি বলেন,

(إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلاَ يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ)

অর্থাৎ, তোমরা কাফের হলে জেনে রাখ, আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। তিনি তাঁর দাসদের জন্য কুফরী পছন্দ করেন না। যদি তোমরা তার প্রতি কৃতজ্ঞ হও তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তা পছন্দ করেন। *(সূরা যুমার ৭আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

(اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيْناً)

অর্থাৎ, আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীনরূপে মনোনীত করলাম। *(সূরা মা-য়েদাহ ৩ আয়াত)*

সুতরাং কুফরীর উপর ওদেরকে শুভাশীষ ও সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন হারাম- চাহে তারা ঐ ব্যক্তির কর্মক্ষেত্রে সহকর্মী বা সঙ্গী হোক, চাহে না হোক।

যখন ওরা ওদের ঈদ উপলক্ষে আমাদেরকে মুবারকবাদ জানায় তখনও আমরা তাদেরকে প্রত্যুত্তরে অভিবাদন জানাতে পারি না। যেহেতু তা আমাদের ঈদ নয়। আল্লাহ তাআলা এমন ঈদকে পছন্দ করেন না। কারণ, তা ওদের ধর্মে অভিনব রচিত কর্ম। অথবা বিধিসম্মত কিন্তু তা দ্বীন ইসলাম দ্বারা রহিত হয়ে গেছে, যে দ্বীন সহ মুহাম্মাদ ﷺ-কে আল্লাহ তাআলা সমগ্র সৃষ্টির প্রতি প্রেরণ করেছেন। যে দ্বীন সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

(وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيْناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ)

অর্থাৎ, যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম চাইলে তা কখনও তার নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে না এবং সে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হবে। *(আ-লি ইমরান ৮৫)*

এই উপলক্ষে মুসলিমদের জন্য তাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করাও হারাম। যেহেতু দাওয়াত গ্রহণ মুবারকবাদ জ্ঞাপন অপেক্ষা নিকৃষ্টতর। কারণ এতে ওদের ঈদে অংশ গ্রহণ করা হয়।

তদনুরূপ মুসলমানদের জন্য এই উপলক্ষে অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করে, পরস্পরকে উপঢৌকন প্রদান করে, মিষ্টান্ন বিতরণ করে, বিভিন্ন প্রকার খাদ্য বণ্টন করে অথবা কর্মক্ষেত্রে ছুটি ঘোষণা করে কাফেরদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা বৈধ নয়। কারণ নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যাক্তি যে সম্প্রদায়ের আনুরূপ্য অবলম্বন করে সে তাদেরই দলভুক্ত।”

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া তাঁর গ্রন্থ 'ইকতিযা-উস সিরাত্বিল মুস্তাকীম, মুখা-লাফাতু আসহা-বিল জাহীম'এ বলেন, 'তাদের কিছু ঈদ-পর্বে তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন, তারা যে বাতিলে অবিচলিত তাতে তাদের অন্তর খুশীতে ভরে ওঠার কারণ হবে এবং সম্ভবতঃ এই আনুরূপ্য তাদের সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ও দুর্বলদেরকে অধীনস্থ করতে সহায়তা করবে।'

যে ব্যক্তি উপর্যুক্ত কিছু করে ফেলেছে সে গোনাহগার হবে। চাহে সে তা শিষ্টাচারিতা, বন্ধুত্ব, চক্ষুলজ্জা বা অন্য কিছুর খাতিরে করুক না কেন। যেহেতু এমন করা আল্লাহর দ্বীনে তোষামোদ করা, কাফেরদের আত্মা-মনকে সবল করে তোলা এবং তাদের ধর্ম নিয়ে গর্ব করার উপকরণের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহই প্রার্থনাস্থল। তিনি মুসলিমদেরকে তাদের ধর্ম সহ সম্মানিত ও শক্তিশালী করুন। দ্বীনের উপর তাদেরকে দৃঢ়স্থিরতা দান করুন এবং তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করুন। নিশ্চয় তিনি মহাশক্তিমান পরাক্রমশালী। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর নিমিত্তে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও জানাযার নামায

(শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায)

১। মানুষকে নিশ্চিতভাবে মৃত বুঝা গেলে তার চক্ষুদ্বয়কে বন্ধ করে দিতে হয় এবং থুতনি (মাথার সাথে কাপড় দ্বারা) বেঁধে দিতে হয়।(যাতে মুখ হাঁ হয়ে না থাকে)।

২। মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার সময় ঃ-

তার লজ্জাস্থান আবৃত করে, লাশকে সামান্য উঠিয়ে পেটে হাল্কা চাপ দিয়ে নিংড়াতে হবে (এতে মলমূত্র কিছু থাকলে বের হয়ে যাবে)। গোসল দাতা নিজের হাতে বস্ত্রখন্ড বা অনুরূপ কিছু জড়িয়ে নেবে এবং তার দ্বারা মৃতব্যক্তির মলমূত্র ইত্যাদি পরিস্কার করবে। অতঃপর তার ডান পার্শ্ব প্রথমে ধৌত করবে, তারপর বাম পার্শ্ব। অনুরূপ দুই ও তিনবার ধৌত করবে। প্রত্যেক বারে তার পেটে হাত ফিরাবে। তাতে যদি কিছু বের হয় তবে তা ধৌত করে ঐ স্থান (পায়ুপথ) তুলো দ্বারা বন্ধ করে দেবে। যদি তাতে বন্ধ না হয় তাহলে এঁটেল কাদা দ্বারা বা অভিনব চিকিৎসা বিজ্ঞানের কোন দ্রব্য-যেমন আঠাল পটি ইত্যাদি দ্বারা বন্ধ করবে এবং পুনরায় তাকে উযু করাবে। যদি তিনবার ধৌত করেও পরিস্কার না হয় তাহলে পাঁচবার অথবা সাতবার পর্যন্ত ধোওয়া যায়। অতঃপর কাপড় দ্বারা মৃতের দেহ মুছে শুস্ক করবে। অতঃপর তার বগল, উরুমূল এবং সিজদার জায়গা সমূহে সুগন্ধি লাগাবে। যদি সারা দেহটাই সুগন্ধিত করে তো সেটাই উত্তম। তার কাফনকে (সুগন্ধ কাঠের ধুয়াঁ দ্বারা) সুগন্ধিত করবে। তার গোঁফ ও নখ লম্বা থাকলে কেটে ফেলবে। মাথার চুল আঁচড়াবে না। মহিলার কেশদামকে তিনটি বেণী করে তার পশ্চাতে ছেড়ে রাখবে।

৩। মৃত ব্যক্তিকে কাফন পরানো ঃ-

মৃতব্যক্তিকে তিনটি সাদা কাপড় দ্বারা কাফনানো হবে। যাতে কামীস ও পাগড়ী থাকবে না। সাধারণভাবে ঐ কাপড়গুলিকে উপর্যুপরি বিছিয়ে তাতে লাশ রেখে জড়িয়ে দেবে। যদি কামীস, ইযার (লুঙ্গি) ও লিফাফা (চাদর)এ কাফনায় তো তাতেও দোষ নেই। মহিলাকে পাঁচ কাপড় ; কামীস, উড়নী, ইযার ও দুটি চাদর দ্বারা কাফনাবে। শিশুকে এক থেকে তিনটি কাপড়ে কাফনানো হবে এবং শিশুকন্যাকে কামীস ও দুটি চাদরে কাফনানো হবে।

৪। মৃতব্যক্তিকে গোসল দান, তার উপর জানাযা পড়া এবং তাকে দাফন করার অধিক হকদার কে ?

মৃতব্যক্তি জীবিতকালে যাকে অসিয়ত করে যাবে সেই এই সবের অধিক হকদার। অতঃপর তার পিতা, অতঃপর পিতামহ, অতঃপর রক্ত সম্পর্কের সর্বাপেক্ষা নিকটতম আত্মীয় পুরুষ, অতঃপর তার চেয়ে কম নিকটের আত্মীয় পুরুষ। মৃত মহিলাকে গোসল দেওয়ার অধিক হকদার সেই মহিলা যাকে সে জীবিতাবস্থায় অসিয়ত করে গেছে। অতঃপর তার মাতামহী ও পিতামহী, অতঃপর সর্বাপেক্ষা নিকটতম আত্মীয়া মহিলা। আর স্বামী-স্ত্রী এক অপরকে গোসল দিতে পারে।

৫। জানাযার নামায পড়ার পদ্ধতি ঃ-

তকবীর দিয়ে নামাযী সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। এর সঙ্গে যদি ছোট সূরা অথবা দুটি আয়াত পাঠ করে তো উত্তম। যেহেতু এ সম্বন্ধে হাদীস বর্ণিত আছে। অতঃপর তকবীর দিয়ে নবী ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ করবে।

এরপর তকবীর দিয়ে বলবে,

اللهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنا وَمَيِّتِنا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، (إِنَّكَ تَعْلَمُ مُنْقَلَبَنَا وَمَثْوَانَا، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر.) اللهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيْمَانِ. اللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ، وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَفْسَحْ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ.

“আল্লাহুম্মাগ্‌ফির্‌ লিহাইয়িনা অ মাইয়িতিনা অ শা-হিদিনা অগা-ইবিনা অ সাগী-রিনা অ কাবী-রিনা অ যাকারিনা অ উনষা-না। (ইন্নাকা তা’লামু মুনক্বালাবানা অ মাষ্‌ওয়া-না, অ আন্তা আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর)।

আল্লাহুম্মা মান আহয়্যাইতাহু মিন্না ফাআহয়িহী আলাল ইসলা-ম। অমান তাওয়াফ্‌ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্‌ফাহু আলাল ঈমান।

আল্লাহুম্মাগ্‌ফির লাহু অরহাম্‌হু অ আ-ফিহী অ'ফু আনহু অ আকরিম নুযুলাহু অ ওয়াস্‌সি' মাদ্‌খালাহু অগ্‌সিলহু বিল মা-ই অস্‌সালজি অল বারাদ। অনাক্কিহী মিনাল খাত্বা-য়া কামা নাক্কাইতাস্‌ ষাউবাল আব্‌য়্যায়া মিনাদ্‌ দানাস। অ আবদিলহু দা-রান খাইরাম মিন দা-রিহ, অ আহলান খাইরাম মিন আহলিহ। অ আদ্‌খিলহুল জান্নাতা অ আইয্‌হু মিন আযা-বিল ক্বাবরি অ আযা-বিন না-র। অফ্‌সাহ লাহু ফী ক্বাবরিহী অ নাউয়্যির লাহু ফী-হ।"

অর্থ, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জীবিত, মৃত, উপস্থিত, অনুপস্থিত, ছোট, বড়, পুরুষ ও নারীকে ক্ষমা করে দাও। (নিশ্চয় তুমি আমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল ও বাসস্থান জান এবং তুমি সর্ববস্তুর উপর সর্বশক্তিমান।) হে আল্লাহ! তুমি আমাদের মধ্যে যাকে জীবিত রাখবে তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখ এবং যাকে মৃত্যু দেবে তাকে ঈমানের উপর মৃত্যু দাও।

আল্লাহ গো! তুমি ওকে মাফ করে দাও, ওর প্রতি দয়া কর, ওকে নিরাপত্তা দাও, ওকে মার্জনা করে দাও, ওর মেহেমানীকে সম্মানজনক কর, ওর প্রবেশস্থলকে প্রশস্ত কর, ওকে পানি, বরফ ও করকা দ্বারা ধৌত করে দাও। ওকে গোনাহসমূহ থেকে এমন পবিত্র কর যেমন তুমি সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার করেছ। ওর ঘরের পরিবর্তে উত্তম ঘর এবং ওর পরিবারের পরিবর্তে উত্তম পরিবার দান কর। ওকে জান্নাত প্রবেশ করাও এবং দোযখ ও কবরের আযাব থেকে আশ্রয় দাও। ওর কবরকে প্রশস্ত কর এবং ওর জন্য তা আলোকিত করে দাও।

অতঃপর তকবীর দিয়ে ডান দিকে একবার সালাম ফিরবে।

প্রত্যেক তকবীরের সাথে হাত তুলবে। মৃত মহিলা হলে 'আল্লাহুম্মাগফির লাহা--' (অর্থাৎ 'হু'এর স্থলে 'হা') বলবে। মৃত ছোট শিশু হলে মাগফিরাতের দুআর পরিবর্তে নিম্নের দুয়া পঠনীয়;

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطاً وذُخْراً لِوالِدَيْهِ وَشَفِيْعاً مُجَاباً، اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِيْنَهُمَا وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُوْرَهُمَا وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاجْعَلْهُ فِيْ كَفَالَةِ إِبْرَاهِيْمَ وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيْمِ.

“আল্লাহুম্মাজআলহু ফারাত্বাঁউ অ যুখরাল লি ওয়া-লিদাইহি অ শাফীআম মুজা-বা। আল্লাহুম্মা যাক্কিল বিহী মাওয়া-যীনাহুমা অ আ'যিম বিহী উজ-রাহুমা অ আলহিক্বহু বিসা-লিহিল মু'মিনী-ন। অজআলহু ফী কাফা-লাতি ইবরা-হীম, অক্বিহী বিরাহমাতিকা আযা-বাল জাহীম।”

অর্থ, হে আল্লাহ! তুমি ওকে ওর পিতা-মাতার জন্য অগ্রবর্তী, সওয়াবের পুঞ্জ এবং গ্রহণযোগ্য সুপারিশকারী বানাও। আল্লাহ গো! তুমি ওর দ্বারায় ওর মা-বাপের নেকীর পাল্লা ভারী করো, ওদের সওয়াবকে বৃহৎ কর, ওকে নেক মুমিনদের দলে মিলিত কর, ইবরাহীমের জমানতে রাখ এবং তোমার রহমতে জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাও।

আল্লাহ তাঁর দাস ও রসূল মুহাম্মাদ, তাঁর বংশধর ও সহচরবৃন্দের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন।

মৃতব্যক্তির আত্মীয়দেরকে চুম্বন

প্রশ্ন ঃ- তা'যিয়ার (কেউ মারা গেলে তার আত্মীয়-স্বজনকে দেখা করার) সময় মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দেরকে চুম্বন দেওয়া বৈধ কি ?

উত্তর ঃ- তা'যিয়ার সময় মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনকে চুম্বন দেওয়ার ব্যাপারে কোন সুন্নাহ (হাদীস) জানি না। তাই মানুষের জন্য উচিত নয়, এটাকে

সুন্নাহ বলে ধারণ করা। যেহেতু যে কর্ম আল্লাহর নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবা ﷺ থেকেও উল্লেখিত হয়নি সে কর্ম থেকে দূরে থাকা সকল মানুষের কর্তব্য।

(ফাতাওয়াত তা’যিয়াহ, শায়খ মুহাম্মদ বিন উসাইমীন, ৪৩ পৃঃ)

কবরের উপর চলা

প্রশ্ন ঃ- কবরের উপর চলা বৈধ কি ?

উত্তর ঃ- কবরের উপর চলা বৈধ নয়। যেহেতু তাতে মৃতব্যক্তির অপমান হয়। নবী ﷺ কবরকে চুনকাম করতে, তার উপর ইমারত বানাতে এবং তার উপর লিখতে নিষেধ করেছেন। কবরের উপর বসা প্রসঙ্গে বলেছেন, “তোমাদের কারো আঙ্গারের উপর বসা ও কাপড় পুড়ে চামড়া পুড়ে যাওয়াটা কবরের উপর বসার চেয়ে উত্তম।” *(সহীহুল জামে’ ৫০৪২নং)*

(ফাতাওয়াত তা’যিয়াহ, মুহাম্মাদ বিন উসাইমীন, ২৭পৃঃ)

তা’যিয়ার জন্য সফর করা

প্রশ্ন ঃ- তা’যিয়ার জন্য সফর করা বৈধ কি? যেমন অনেকে নিজের বাসস্থান থেকে তা’যিয়ার (দূরবর্তী) স্থানে সফর করে যায়?

উত্তর ঃ- তা’যিয়ার জন্য সফর করা বৈধ মনে করি না। তবে হ্যাঁ, যদি ঐ ব্যক্তি নিকটাত্মীয় একান্ত আপন কেউ হয় এবং তা’যিয়ার জন্য সফর না করা জ্ঞাতি-বন্ধন ছিন্ন করায় গণ্য হয়, তাহলে এই অবস্থায় হয়তো বলব যে, সে তা’যিয়ার জন্য সফর করবে। যাতে সফর ত্যাগ করা জ্ঞাতি-বন্ধন ছিন্ন করাতে না পৌঁছে দেয়। *(ফাতাওয়াত তা’যিয়াহ, শায়খ মুহাম্মাদ বিন উসাইমীন ৮/পৃঃ)*

তা’যিয়ার স্থান ও সময়

প্রশ্ন ঃ- তা’যিয়া কি নির্ধারিত স্থান ও সময়ে সীমাবদ্ধ ?

উত্তর ঃ- তা'যিয়ার কোন স্থান দ্বারা নির্দিষ্ট নয়। বরং যেখানেই বিপদগ্রস্তকে দেখতে পাবে, মসজিদে, পথে বা যে কোন স্থানে তার তা'যিয়া (সাক্ষাৎ করে বিপদে সান্ত্বনা দান ও সমবেদনা প্রকাশ) করবে। অনুরূপ তা'যিয়া কোন সময়েও সীমাবদ্ধ নয়। বরং যতক্ষণ বা কাল পর্যন্ত তার অন্তরে মসীবতের প্রভাব অবশিষ্ট থাকে, ততক্ষণ কাল পর্যন্ত তার তা'যিয়া করা হবে। কিন্তু তা'যিয়ার ঐ পদ্ধতিতে নয় যা কিছু লোক অভ্যাস বানিয়ে নিয়েছে; যারা একটি জায়গায় বসে, সমস্ত দরজা খুলে রাখে, (অতিরিক্ত) লাইট ও বাতি জ্বালিয়ে থাকে, সারি সারি চেয়ার সাজিয়ে রাখে ইত্যাদি। যেহেতু এ সব কিছু বিদআতের মধ্যে গণ্য যা মানুষের করা উচিত নয়। কারণ এ সব সলফে সালেহীনদের যুগে পরিচিত ছিল না। বরং জারীর বিন আব্দুল্লাহ আল বাজালী ﷺ বলেন, দাফনের পর মৃতব্যক্তির পরিবারের নিকট সমবেত হওয়া এবং খানা প্রস্তুত করাকে আমরা (নিষিদ্ধ) মাতম-জারির মধ্যে গণ্য করতাম।

(ফাতাওয়াত তা'যিয়াহ, শায়খ মুহাম্মাদ বিন উসাইমীন। ৬/পৃঃ)

পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে তা'যিয়া করা

প্রশ্ন ঃ- পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে তা'যিয়া করা বৈধ কি ? যাতে কখনো কখনো কিছু আয়াতও লিখে থাকে। যেমন, আল্লাহ তাআ'লার এই বাণী,

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِيْ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً)

"হে প্রশান্ত চিত্ত! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে ফিরে এস---।"

উত্তর ঃ- এরূপ করা সেই 'মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণা' করার মধ্যে গণ্য যা থেকে নবী ﷺ নিষেধ করেছেন। যেহেতু এতে উদ্দেশ্য হয় তার মৃত্যুসংবাদ প্রসিদ্ধ ও প্রচার করা। আর এটা সেই 'মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণা'র মধ্যে পরিগণিত, যা থেকে নবী ﷺ নিষেধ করেছেন।

(ফাতাওয়াত তা'যিয়াহ, মুহাম্মদ বিন উসাইমীন,৬ পৃঃ)

সুদী ব্যাঙ্কে অংশগ্রহণ ও চাকুরী করা

মহামান্য শায়খ মুহাম্মদ বিন সা-লেহ আল উসাইমীন,হাফিযাহুল্লাহ!

আসসালামু আলাইকুম অরাহমাতুল্লা-হি অবারাকা-তুহ।

অতঃপর, মহামান্যের নিকট নিম্নোক্ত প্রশ্নাবলীর উত্তর কামনা করি ;

প্রশ্ন ঃ- বর্তমানে রিয়ায ব্যাঙ্কে অংশ নিতে নাম তালিকাভুক্ত করার জন্য প্রচার মাধ্যমগুলোতে প্রচার করা হচ্ছে। তাহলে ওতে অংশগ্রহণ বৈধ কি? এ ব্যাপারে ওলামা ও খতীবদের ভূমিকা কি? রিয়ায বা অন্যান্য ব্যাঙ্কে যাতে সুদী কারবার হয় তাতে চাকুরী করার ব্যাপারে মহামান্যের অভিমত কি?

উত্তর ঃ- *অ আলাইকুমুস সালা-মু অরাহমাতুল্লা-হি অবারাকা-তুহ।*

এ কথা বিদিত যে, মূলতঃ ব্যাঙ্কসমূহ সূদের উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ যেমন, আপনি এক হাজার জমা দেবেন এবং তুলবেন এক হাজার দুই শত, অথবা নেবেন এক হাজার এবং দেবেন এক হাজার দুই শত। তাতে আপনি সূদখোর ও সূদদাতা উভয়ই হবেন। যদিও ঐ সমস্ত ব্যাঙ্কে সূদবিহীন অন্যান্য কারবারও হয়ে থাকে তবুও (এতে লেন দেন করা অবৈধ); যেহেতু এর প্রতিষ্ঠাই সূদের উপর। এটাই বিদিত।

সুতরাং এই কথার উপর ভিত্তি করে ঐ সমস্ত ব্যাঙ্কে অংশ গ্রহণ করা বৈধ নয়। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন,

(اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَا لاَ يَقُوْمُوْنَ إِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ

فِيْهَا خَالِدُوْنَ، يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيْمٍ)

অর্থাৎ-"যারা সুদ খায় তারা সেই ব্যক্তির মত দন্ডায়মান হবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে দিয়েছে। ইহা এই জন্য যে তারা বলে, 'ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মতই।' অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ ও সূদকে অবৈধ করেছেন। যার কাছে তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে তার পর সে বিরত হয়েছে তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই এবং তার ব্যাপার আল্লাহর অধিকারভুক্ত। আর যারা পুনরায় (সূদ) নিতে আরম্ভ করবে তারাই দোযখবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ প্রত্যেক কৃতঘ্ন পাপীকে ভালবাসেন না।" *(সূরা বাক্বারাহঃ২৭৫-২৭৬ আয়াত)*

সুতরাং উক্ত আয়াতে স্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে যে, সূদ হারাম। সেই আল্লাহ তা হারাম করেছেন যাঁর জন্য সকল রাজত্ব, একক তাঁরই সার্বভৌম শাসন কর্তৃত্ব। সকল বিচার-মীমাংসার রুজু তাঁরই অনুশাসনের প্রতি। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াতের পরবর্তী আয়াতে বর্ণনা করেন যে, সূদ গ্রহণ করা- আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার সমান। তিনি বলেন,

(يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ، فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُوْنَ وَلاَ تُظْلَمُوْنَ)

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সূদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হও। আর যদি তোমরা না ছাড় তাহলে জেনে রাখ যে, এ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (করার শামিল)। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। তোমরা অত্যাচারী হবেনা এবং অত্যাচারিতও হবে না।" *(সূরা বাক্বারাহ ২৭৮-২৭৯ আয়াত)*

সহীহ মুসলিমে জাবের বিন আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ সূদখোর, সূদদাতা, সূদের লেখক ও সূদের সাক্ষীদেরকে অভিশপ্ত করেছেন এবং বলেছেন, ওরা সকলেই সমান।' লানত (অভিশাপ) করা আল্লাহর রহমত থেকে দূর ও বিতাড়ণ করাকে বলে। ওলামাগণ এর এইরূপই ব্যাখ্যা করেছেন।

উপরোক্ত দুই আয়াত ও হাদীস স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, সূদ খাওয়া কাবীরা গোনাহর পর্যায়ভুক্ত। হাদীসে নির্দেশ রয়েছে যে, সূদের (খাতা-পত্র, লেন-দেন ও হিসাব-বাকী ইত্যাদি) লিখেও সূদ গ্রহণের উপর সাক্ষি ইত্যাদি দিয়ে সূদী কার-বারে সাহায্য ও সহায়তাকারীও আল্লাহর লা'নতে শামিল এবং এতে সে সূদখোর ও সূদদাতার সমান। এখান হতে সাক্ষি বা লিখা দ্বারা- যেখানে তদ্দ্বারা সূদ সাব্যস্ত ও প্রমাণ করে এমন ক্ষেত্রে চাকুরী বা কর্ম করার বৈধতা-অবৈধতা স্পষ্ট হয়ে যায়।

এ বিষয়ে এবং আরো অন্যান্য সকল বিষয়ে-যা মুসলিমদের নিকট অস্পষ্ট থাকে অথবা যা বর্ণনা করা এবং যা হতে সাবধান ও সতর্ক করার প্রয়োজন পড়ে তাতে ওলামা ও বক্তাদের ভূমিকা বিরাট ওয়াজেব ভূমিকা এবং এক মহান দায়িত্ব। যেহেতু আল্লাহ তাঁদেরকে ইলম দান করেছেন যাতে তাঁরা মানুষের জন্য বিবৃত করেন।

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, যেন তিনি আমাদেরকে এবং আমাদের সকল ভ্রাতৃবর্গকে যাতে ইহ-পরকালে মানুষের কল্যাণ আছে তাতে সাহায্য করুন।

লিখেছেনঃ-মুহাম্মদ বিন সা-লেহ আল উসাইমীন। ৯/৭/১৪১২ হিঃ

সূদী ব্যাঙ্কে চাকুরী

প্রশ্ন ঃ- সূদী ব্যাঙ্কে চাকুরী করা এবং এর সহিত আদান-প্রদান করা বৈধ কি?

উত্তর ঃ- এতে চাকুরী করা হারাম। যেহেতু এতে চাকুরী করার অর্থই হল- সূদের উপর সহায়তা করা। অতএব যদি সূদী কারবারের উপর সহায়তা হয় তাহলে সে (চাকুরে) সহায়ক হিসাবে অভিশাপে শামিল হবে। নবী ﷺ হতে শুদ্ধভাবে বর্ণিত যে, তিনি সূদখোর, সূদদাতা, তার সাক্ষিদাতা ও তার লেখককে অভিসম্পাত করেছেন এবং বলেছেন, "ওরা সবাই সমান।"

পক্ষান্তরে এ কাজ যদি সূদী কারবারের উপর সহায়ক না হয় তাহলেও উক্ত কারবারে তার সম্মতি ও মৌন সমর্থন প্রকাশ পায়। তাই সূদী ব্যাঙ্কে চাকুরী নেওয়া বৈধ নয়।

অবশ্য প্রয়োজনে ঐ ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখায় ক্ষতি নেই- যদি ঐ সমস্ত ব্যাঙ্ক ছাড়া টাকা জমা রাখার জন্য আমরা অন্য কোন ভিন্ন নিরাপদ স্থান না পাই। তবে এই শর্তে যে, তা থেকে যেন কেউ সূদ গ্রহণ না করে। যেহেতু সূদ গ্রহণ অবশ্যই হারাম। *(আসইলাতুম মুহিম্মাহ, শায়খ মুহাম্মদ বিন আল উসাইমীন, ২৯পৃঃ)*

ব্যায়াম-চর্চা

প্রশ্ন ঃ- হাফ প্যান্ট পরে ব্যায়াম-চর্চা করা বা খেলা বৈধ কি ? এমন চর্চাকারীকে দর্শন করাই বা কি ?

উত্তর ঃ- ব্যায়াম-চর্চা করা বৈধ; যদি তা কোন ওয়াজেব জিনিস বা কর্ম থেকে উদাসীন ও প্রবৃত্ত করে না ফেলে। কারণ তা যদি কোন ওয়াজেব কর্ম থেকে প্রবৃত্ত করে তাহলে হারাম হবে। আবার যদি ব্যায়াম করা কারো চিরাচরিত অভ্যাস হয় যাতে তার অধিকাংশ সময় তাতেই ব্যয় হয়, তাহলে তা সময় নষ্টকারী অভ্যাস। যার সর্বনিম্ন মান হবে মকরূহ (ঘৃণিত আচরণ)।

পক্ষান্তরে যদি ব্যায়াম চর্চাকারীর দেহে কেবল হাফ প্যান্ট্ থাকে, যাতে তার জাং অথবা জাঙ্গের বেশীর ভাগ অংশ দেখা যায় তাহলে তা অবৈধ। যেহেতু শুদ্ধ অভিমত এই যে, যুবকের জন্য তার উরু আবৃত করা ওয়াজেব। তাই যদি খেলোয়াড়রা উক্ত উরু খোলা রাখা অবস্থায় থাকে তাহলে তাদেরকে (ও তাদের খেলা) দর্শন করা বৈধ নয়। ([3])

(আসইলাতুম মুহিম্মাহ, শায়খ মুহাম্মদ বিন উসাইমীন, ২৮ পৃঃ)

সমলিঙ্গী ব্যভিচার

প্রশ্ন ঃ- দ্বীনে সমমৈথুন প্রসঙ্গে বিধান কি? এ কাজের ফলে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠে- একথা কি সত্য? মহামান্যের নিকট এ বিষয়ে এমন উত্তর কামনা করি যা পরিপূর্ণ দলীল দ্বারা বলিষ্ঠ। আর তা আমার জন্য ও অন্যের জন্যও (এ কুকর্ম হতে) বিরতকারী হয়। আল্লাহ আপনাকে নেক বদলা দিন।

উত্তর ঃ- সমমৈথুন; পুরুষ-সঙ্গম বা পুরুষে-পুরুষে পায়ুপথে কুকর্ম করাকে বলে। আর এরই অনুরূপ স্ত্রীর মলদ্বারে সঙ্গম করাও। এটা সেই কুকর্ম যা লূত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় করেছিল। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

(أَتَـأْتُـوْنَ الـذُّكْرَانَ مِنَ الـْعَالَـمِيْنَ)

অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে তোমরা তো কেবল পুরুষদের সাথেই উপগত হও। *(সূরা শুআরা ১৬৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

(إِنَّكُمْ لَـتَـأْتُـوْنَ الـرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ الـنِّسَاءِ بَـلْ أَنْـتُمْ قَـوْمٌ مُّسْرِفُـوْنَ)

অর্থাৎ, তোমরা তো কাম-তৃপ্তির জন্য নারী ত্যাগ করে পুরুষদের নিকট গমন কর! *(সূরা আ'রাফ ৮১আয়াত)*

([3]) *এতো পুরুষ ব্যায়াম চর্চাকারী ও খেলোয়াড়দের কথা। পক্ষান্তরে চর্চাকারিণী বা খেলোয়াড় যদি নারী হয়, তাহলে তার অবৈধতার গাঢ়তা কত তা অনুমেয়! (অনুবাদক)*

আল্লাহ তাদেরকে এই কুকাজের শাস্তি স্বরূপ তাদের ঘর-বাড়ি উল্টে দিয়েছিলেন এবং আকাশ থেকে তাদের উপর বর্ষণ করেছিলেন পাথর। তিনি বলেন,

(فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ)

অর্থাৎ, (অতঃপর যখন আমার আদেশ এল) তখন আমি (তাদের নগরগুলোর) উর্ধ্বভাগকে নিম্নভাগে পরিণত করেছিলাম এবং আমি তাদের উপর ক্রমাগত কঙ্কর বর্ষণ করেছিলাম। *(সূরা হিজ্র ৭৪ আয়াত)*

সুতরাং উক্ত সম্প্রদায়ের মত কুকর্মে যে লিপ্ত হবে সেও উপর্যুক্ত শাস্তির উপযুক্ত। তাই এমন দুরাচার প্রসঙ্গে কিছু সাহাবা ﵃ এর ফতোয়া হল, তাকে জ্বালিয়ে মারা হবে। কেউ কেউ বলেন, উঁচু জায়গা হতে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলা হবে।

এ বিষয়ে একাধিক হাদীসও নবী ﷺ হতে বর্ণিত হয়েছে; এক হাদীসে তিনি বলেন, "যাকে লূত সম্প্রদায়ের মত কুকর্মে লিপ্ত পাবে তাকে এবং যার সাথে এ কাজ করা হচ্ছে তাকেও তোমরা হত্যা করে ফেল।"

আমরা পাঠককে ইমাম ইবনুল কাইয়েমের গ্রন্থ 'আল জাওয়াবুল কা-ফী' পাঠ করতে অনুরোধ করছি। কারণ লেখক উক্ত গ্রন্থে এই কুকর্মের কদর্যতার প্রমাণে বহু দলীলাদি সংকলন করেছেন। আর আল্লাহই অধিক জানেন।

(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ, শায়খ আব্দুল্লাহ বিন জিবরীন ৩/৩৭৩ পৃঃ)

হস্ত মৈথুন কি?

প্রশ্ন ঃ- গুপ্ত অভ্যাস ব্যবহার করা বৈধ কি ?

উত্তর ঃ- গুপ্ত অভ্যাস (হাত বা অন্য কিছুর মাধ্যমে বীর্যপাত বা হস্তমৈথুন) করা কিতাব, সুন্নাহ ও সুস্থ বিবেকের নির্দেশ মতে হারাম।

কিতাব বা কুরআনের দলীল; আল্লাহ তাআলা বলেন,

(وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ، وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُوْنَ، وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ، إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ، فَمَنِ ابْتَغَي وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ)

অর্থাৎ, যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। তবে নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে অন্যথা করলে তারা নিন্দনীয় হবে না। আর যারা এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করে তারাই সীমালংঘনকারী।” *(সূরা মু’মিনূন ৫-৭)*

সুতরাং যে ব্যক্তি তার স্ত্রী ও অধিকারভুক্ত দাসী ([4]) ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা কামলালসা চরিতার্থ করতে চায় সে ব্যক্তি “এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করে।” বলা বাহুল্য, এই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে সে সীমালংঘনকারী বলে বিবেচিত হবে।

সুন্নাহ থেকে দলীল, আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, “হে যুবকের দল! তোমাদের মধ্যে যে কেউ স্ত্রী-সঙ্গম ও বিবাহ-খরচে সমর্থ সে যেন বিবাহ করে। কারণ তা অধিক দৃষ্টি-সংযতকারী এবং অধিক যৌনাঙ্গ-রক্ষাকারী। আর যে ব্যক্তি এতে অসমর্থ সে যেন রোযা অবলম্বন করে, যেহেতু তা এর জন্য (খাসী করার মত) কামদমনকারীর সমান।” *(বুখারী, মুসলিম)*

সুতরাং নবী ﷺ বিবাহে অসমর্থ ব্যক্তিকে রোযা রাখতে আদেশ করলেন, অথচ যদি হস্তমৈথুন বৈধ হত, তবে নিশ্চয় তিনি তা করতে নির্দেশ দিতেন। অতএব তা সহজ হওয়া সত্ত্বেও যখন তিনি তা করতে নির্দেশ দিলেন না তখন জানা গেল যে তা বৈধ নয়।

আর সুচিন্তিত মত এই যে, যেহেতু এই কাজে বহুমুখী ক্ষতি ও অনিষ্টের আশঙ্কা রয়েছে যা চিকিৎসাবিদ্‌গণ উল্লেখ করে থাকেন; এতে এমন ক্ষতি

([4]) অধিকারভুক্ত দাসী বলে ক্রীতদাসী ও কাফের যুদ্ধবন্দিনীকে বুঝানো হয়েছে। এখানে কাজের মেয়ে, দাসী, খাদেমা বা চাকরানী উদ্দেশ্য নয়।

রয়েছে যা স্বাস্থ্যের পক্ষে বড় বিপজ্জনক; যৌন শক্তিকে দুর্বল করে ফেলে, চিন্তাশক্তি ও দূরদর্শিতার ক্ষতি করে এবং কখনো বা এর অভ্যাসী ব্যক্তিকে প্রকৃত দাম্পত্যসুখ থেকে বঞ্চিত করে। কারণ যে কেউ এ ধরনের অভ্যাসে নিজ কাম-লালসাকে চরিতার্থ করে থাকে সে হয়তো বা বিবাহের প্রতি ভ্রূক্ষেপই করবে না। *(আসইলাতুম মুহিম্মাহ, শায়খ মুহাম্মদ বিন উসাইমীন ৯ পৃঃ)*

ছবি তোলা

শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায।

প্রশ্ন ঃ- ছবি তোলার ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি? যাতে বিপত্তি বড় ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছে এবং লোক তাতে আলিপ্ত হয়ে পড়েছে।

উত্তর ঃ- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। করুণা ও শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর উপর যাঁর পর আর কোন নবী নেই। অতঃপর ; সিহাহ, মাসানীদ ও সুনান গ্রন্থ সমূহে নবী ﷺ হতে বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা মানুষ অথবা কোন প্রাণীর ছবি তুলতে (ও আঁকতে) হারাম বলে নির্দেশ করে, ছবিযুক্ত পর্দা ছিঁড়ে ফেলতে উদ্বুদ্ধ করে, ছবি মুছে ফেলতে আদেশ করে, ছবি যারা তুলে বা আঁকে তাদেরকে অভিশাপ করে এবং বিবৃতি দেয় যে, তারা কিয়ামতের দিন অধিক আযাব ভোগ করবে।

আমি আপনার জন্য এ বিষয়ে বর্ণিত কিছু সহীহ হাদীস এবং ওলামাদের কিছু বক্তব্য উল্লেখ করব। আর এ মাসআলায সঠিক মত তাই ব্যক্ত করব ইনশাআল্লাহ।

সহীহায়ন (বুখারী ও মুসলিম)এ আবু হুরাইরা ؓ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, "তার চেয়ে অধিক সীমালংঘনকারী আর কে, যে আমার সৃষ্টির অনুরূপ কিছু সৃষ্টি করতে যায়? অতএব তারা একটিমাত্র শস্যদানা সৃষ্টি করুক অথবা একটি মাত্র যব সৃষ্টি করুক তো।" হাদীসের শব্দগুলি মুসলিম শরীফের।

উক্ত দুই গ্রন্থেই আবু সাঈদ ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন সব চেয়ে কঠিনতম আযাব ভোগকারী লোক হবে ছবি প্রস্তুতকারীরা।"

উক্ত গ্রন্থেই ইবনে উমর ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় যারা এই ছবি (বা মূর্তিসমূহ) নির্মাণ করে তাদেরকে কিয়ামতের দিন আযাব দেওয়া হবে; বলা হবে, 'তোমরা যা সৃষ্টি করেছ তা জীবিত কর।" শব্দগুলি বুখারী শরীফের।

ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে আবু জুহাইফা ﷺ থেকে বর্ণিত করেছেন যে, নবী ﷺ রক্ত ও কুকুরের মূল্য এবং বেশ্যার উপার্জন গ্রহণ করা থেকে নিষেধ করেছেন। আর সুদখোর, সুদদাতা, চেহারা (নকশা করার জন্য) দাগে বা দাগায় এমন নারী এবং মূর্তি (বা ছবি) নির্মাতাকে অভিসম্পাত করেছেন।

ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোন ছবি বা মূর্তি নির্মাণ করবে (কিয়ামতে) তাকে ওর মধ্যে রূহ ফুঁকতে (প্রাণ দিতে) আদেশ করা হবে। অথচ সে ফুঁকতেই পারবে না।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

ইমাম মুসলিম সাঈদ বিন আবুল হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাসের নিকট এসে বলল, আমি ছবি (বা মূর্তি) নির্মাণ করি অতএব এ বিষয়ে আমাকে ফতোয়া দিন। তিনি বললেন, আমার কাছে এস। লোকটি তাঁর কাছে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, আরো কাছে এস। লোকটি আরো কাছে গেল। অতঃপর তার মাথায় হাত রেখে তিনি বললেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট থেকে যা শুনেছি তাই তোমাকে জানাব; আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "প্রত্যেক মূর্তি বা ছবি নির্মাতা দোযখে যাবে। সে যে সব মূর্তি বা ছবি বানিয়েছে তার প্রত্যেকটির পরিবর্তে এমন জীব তৈরী করা হবে যা তাকে জাহান্নামে আযাব দিতে থাকবে।" ইবনে আব্বাস বলেন, আর যদি তুমি একান্ত করতেই চাও তবে গাছ ও রূহবিহীন বস্তুর ছবি বানাও।

ইমাম মুসলিমের মত ইমাম বুখারী ইবনে আব্বাসের উক্তি (যদি তুমি একান্ত করতেই চাও---)কে এর পূর্বোল্লেখিত হাদীসের শেষাংশে বর্ণনা করেছেন।

(হুকমুল ইসলা-মি ফিত তাসবীর, শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায ও অন্যান্য ওলামা,৩৭-৩৮ পৃঃ)

টেলিভিশন

প্রশ্ন ঃ- টেলিভিশন ব্যবহার বৈধ কি?

উত্তর ঃ- টি,ভি এক বিপজ্জনক যন্ত্র, যার অপকারিতা সিনেমার মত অথবা তার চেয়েও অধিক। এর উপর লিখিত পত্রিকা-পুস্তিকার মাধ্যমে এবং আরব ও অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞদের নিকট থেকে এমন সব কথা জানতে পেরেছি যা আকীদা (বিশ্বাস) চরিত্র এবং সমাজের পরিবেশের উপর এর মারাত্মক বিপত্তি এবং অতিশয় অপকারিতার প্রতি নির্দেশ করে। যেহেতু এর মাধ্যমে নোংরা চরিত্রের অভিনয় হয়, ফিতনা (যৌন উত্তেজনা) সৃষ্টিকারী দৃশ্য এবং নগ্নপ্রায় অশ্লীল ছবি প্রদর্শিত হয়। সর্বনাশী বক্তৃতা ও কুফরী কথন প্রচারিত হয়। কাফেরদের আচরণ ও পরিচ্ছদের সাদৃশ্যাবলম্বন করতে, ওদের মান্যবর ও নেতাদের সম্মান করতে, মুসলিমদের সদাচরণ ও পরিচ্ছদকে ঘৃণা করতে, মুসলিমদের ওলামা সম্প্রদায় এবং ইসলামের বীর-বাহাদুরদেরকে অশ্রদ্ধা করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়। তাঁদের চরিত্রের বীতশ্রদ্ধ অভিনয় করা হয় যাতে তাঁদেরকে ঘৃণ্য বুঝা হয় এবং তাদের চরিতাদর্শ থেকে সকলে বৈমুখ হয়ে যায়। প্রতারণা, ছলনা, কুট-কৌশল, ছিনতাই, লুটতরাজ, চুরি-ডাকাতি এবং মানুষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, কুচক্রান্ত ও অত্যাচারের জাল বোনার বিভিন্ন পথ ও পদ্ধতি প্রদর্শিত হয়। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যে যন্ত্র এত পরিমাণের অপকারী, যার মাঝে এত কিছু বিঘ্ন-বিপত্তি বিন্যস্ত সে যন্ত্রকে প্রতিহত করা, তা থেকে সাবধান ও দূরে থাকা এবং তার প্রতি পথের সকল দরজা বন্ধ করা ওয়াজেব। তাই তাতে যদি সৎকাজে আদেশ ও মন্দকাজে বাধা দানকারী স্বেচ্ছাসেবকরা বাধা দান করে থাকেন এবং ঐ যন্ত্র থেকে হুশিয়ার করে থাকেন

তবে তাদের উপর কোন ভর্ৎসনা নেই। যেহেতু তা আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের জন্য হিতাকাংখা ও পরহিতৈষণা।

আর যে ধারণা করে যে, তত্ত্বাবধান করলে এই যন্ত্র ঐ সমস্ত অনিষ্ট থেকে মুক্ত হতে পারবে এবং কেবলমাত্র সার্বজনীন কল্যাণ প্রচার করবে -তার ধারণা যথাযথ নয়; বরং এ তার মহাভুল। যেহেতু তত্ত্বাবধায়ক উদাসীন হতে পারে। আর যেহেতু মানুষের অধিকাংশ আচরণ বহির্দেশের অনুকরণ করা এবং তারা যা করে তাতে তাদের অনুসরণ করা। তাছাড়া এমন তত্ত্বাবধায়ক খুব কমই আছে, যে দায়িত্বশীলতার সাথে নিজের কর্তব্য পালন করে থাকে। বিশেষ করে বর্তমান যুগে যাতে অধিকাংশ মানুষই ক্রীড়া-কৌতুক ও বাতিলের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, আর যে বস্তু হেদায়াতের পথে বাধা স্বরূপ তারই প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেছে; বাস্তব তার সাক্ষি বহন করে। যেমন কোন কোন এলাকার রেডিও, টি,ভিও এর সত্যতা প্রমাণ করে; যার উভয়েরই জন্য অনিষ্ট নিবারণকারী যথেষ্ট তত্ত্বাবধান করা হয়নি।

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের দেশকে সেই কর্মের তওফীক দান করেন যাতে উম্মাহর ইহ-পরকালে কল্যাণ ও পরিত্রাণ নিহিত আছে। তার জন্য অন্তরঙ্গ সহায়ককে সংশোধন করেন এবং তাঁকে এই প্রচার মাধ্যমগুলির যথার্থ তত্ত্বাবধান করতে সাহায্য করেন; যাতে তার মাধ্যমে মানুষের দ্বীন ও দুনিয়ায় যা হিতকর ও উপকারী কেবল তাই প্রচারিত হয়। নিশ্চয় তিনি দানশীল, মহানুভব। আর আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মাদের উপর দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

(মাজমূআতু ফাতাওয়া, শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায,৩/২২৭)

মিউজিক শ্রবণ ও টি,ভি-সিরিজ দর্শন

প্রশ্ন ঃ- গান-বাজনা শোনা বৈধ কি? সেই সমস্ত টি,ভি-সিরিজ দেখা বৈধ কি? যাতে অর্ধনগ্না নারীদেহ প্রদর্শিত হয়?

উত্তর ঃ- গান-বাজনা শোনা হারাম। আর তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে লেশমাত্র সন্দেহ নেই। সলফে সালেহীন; সাহাবা ও তাবেঈন কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, গান অন্তরে মুনাফেকী (কপটতা) উদ্‌গত করে। উপরন্তু গান শোনা-অসার বাক্য শোনা এবং তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার পর্যায়ভুক্ত। আর আল্লাহ তাআলা বলেন,

(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُواً، أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ)

অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে কেউ কেউ এমনও রয়েছে যারা অজ্ঞতায় লোকদেরকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য বেছে নেয় এবং আল্লাহর প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। ওদেরই জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।" *(সূরা লুকমান ৬ আয়াত)*

ইবনে মসউদ ﷺ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'সেই আল্লাহর কসম যিনি ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই! নিশ্চয় তা (অসার বাক্য) হচ্ছে গান।' সাহাবাগণের ব্যাখ্যা (তফসীর) এক প্রকার দলীল। তফসীরের তৃতীয় পর্যায়ে এর মান রয়েছে। যেহেতু তফসীরের তিনটি পর্যায়; কুরআনের তফসীর কুরআন দ্বারা, কুরআনের তফসীর সুন্নাহ দ্বারা এবং কুরআনের তফসীর সাহাবাগণের উক্তি দ্বারা। এমন কি কিছু ওলামার সিদ্ধান্ত এই যে, সাহাবীর তফসীর রসূলের তফসীরের পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু শুদ্ধ অভিমত এই যে, তা রসূলের তফসীরের পর্যায়ভুক্ত নয়। অবশ্য তা বিভিন্ন উক্তিসমূহের মধ্যে সঠিকতার অধিকতর নিকটবর্তী।

পক্ষান্তরে গান-বাজনা শ্রবণ করার অর্থই হল, সেই কর্মে আপতিত হওয়া যা থেকে নবী ﷺ সাবধান করেছেন। তিনি বলেন, "নিশ্চয় আমার উম্মতের মধ্যে এমন কতক সম্প্রদায় হবে যারা ব্যভিচার, রেশমী বস্ত্র, মদ্য এবং বাদ্য-যন্ত্রকে হালাল মনে করবে।" *(বুখারী প্রভৃতি)* অর্থাৎ তারা নারী-পুরুষের অবৈধ

যৌন-সম্পর্ক, মদপান এবং রেশমের কাপড় পরাকে হালাল ও বৈধ মনে করবে অথচ তারা পুরুষ, তাদের জন্য রেশম বস্ত্র পরিধান বৈধ নয়। অনুরূপ বাজনা শোনাকেও বৈধ ভাববে। আর বাদ্য-যন্ত্র, যার শব্দে মন উদাস হয় এমন অসার যন্ত্রকে বলে। হাদীসটিকে ইমাম বুখারী আবু মালেক আল আশআরী অথবা আবু আমের আল আশআরী থেকে বর্ণনা করেছেন।

সুতরাং এই কথার উপর ভিত্তি করে আমি আমার মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দের প্রতি গান-বাদ্য শ্রবণ করা থেকে সাবধান হওয়ার জন্য এই উপদেশবাণী প্রেরণ করছি। তারা যেন এমন আলেমদের কথায় ধোকা না খায়, যাঁরা বাদ্য-যন্ত্রকে বৈধ বলে মত প্রকাশ করেছেন। যেহেতু এর অবৈধতার সপক্ষে সমস্ত দলীল ব্যক্ত ও সুস্পষ্ট।

আর টি,ভি-সিরিজ যাতে মহিলা প্রদর্শিত হয় তা দেখাও হারাম। যেহেতু তা ফিতনা (বিঘ্ন) এবং (অবৈধ) নারীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার দিকে ধাবিত করে। পরন্তু সমস্ত সিরিজের অধিকাংশই ক্ষতিকারক। যদিও তাতে পুরুষ নারীকে এবং নারী পুরুষকে দর্শন না করে। যেহেতু এ সবের পশ্চাতে সাধারণতঃ উদ্দেশ্য থাকে সমাজকে তার আচরণ ও চরিত্রে ক্ষতিগ্রস্ত করা। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন মুসলমানদেরকে এর অনিষ্ট থেকে বাঁচান। আর আল্লাহই অধিক জানেন। *(আসইলাতুম মুহিম্মাহ, শায়খ মুহাম্মদ বিন উসাইমীন, ২২ পৃঃ)*

মহিলার মার্কেট করা

প্রশ্ন ঃ- কোন মাহরাম ছাড়া মহিলার বাজারে বের হওয়া বৈধ কি না ? তা কখন বৈধ এবং কখন অবৈধ?

উত্তর ঃ- মূলতঃ মহিলার বাজারে বের হওয়া বৈধ। আর তার জন্য মাহরাম থাকাও কোন শর্ত নয়। হ্যাঁ, তবে যদি ফিতনার (ধর্ষণ, টিপ্পনী প্রভৃতির) ভয় থাকে তাহলে মহিলার উপর ওয়াজেব যে, কোন এমন মাহরাম ব্যতীত ঘর

থেকে বের না হওয়া যে তাকে ফিতনা থেকে বাঁচাবে ও রক্ষা করবে। অবশ্য মার্কেটে বের হওয়া বৈধতার জন্য মহিলার উপর শর্ত এই যে, সে বেপর্দায় ও সুগন্ধি ব্যবহার করে বের হবে না।

অন্যথায় সে যদি বেপর্দায় ও সেন্ট ব্যবহার করে বের হতে চায়, তাহলে তা তার জন্য বৈধ নয়। যেহেতু নবী ﷺ বলেন, "আল্লাহর বান্দীদেরকে আল্লাহর মসজিদ যেতে বাধা দিও না। তবে তারা যেন সৌন্দর্য ও সুগন্ধির সাথে না বের হয়।" *(আহমদ ২/৪৩৮, আবু দাউদ ৫৬৫নং, আর আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।)*

যেহেতু মহিলাদের বেপর্দায় ও সুবাস ব্যবহার করে বের হওয়াতে তাদের উপর এবং তাদের তরফ থেকে ফিতনা সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং মহিলা যদি ফিতনা ঘটা থেকে পরিবেশকে নিরাপদ মনে করে এবং অভীষ্ট নিয়মে-পর্দার সাথে ও সৌরভহীন হয়ে বের হয়, তাহলে বের হওয়াতে কোন দোষ নেই। যেহেতু নবী ﷺ-এর যুগে মহিলারা মাহরাম ছাড়াই মার্কেট বের হত।

আসইলাতুম মুহিম্মাহ,ইবনে উসাইমীন, ১৫ পৃঃ

বিধিসম্মত পর্দা

প্রশ্ন ঃ- বিধি সম্মত (শরয়ী) পর্দা কি ?

উত্তর ঃ- শরয়ী পর্দা বলে, নারীর জন্য যা প্রকাশ করা হারাম তা আবৃত করাকে। অন্য কথায়, নারীর জন্য যা গুপ্ত করা ওয়াজেব তা গুপ্ত করাই বিধিসম্মত পর্দা। এ সবের মধ্যে অধিক ও প্রথম আবরণযোগ্য অঙ্গ মুখমন্ডল। যেহেতু মুখমন্ডল ফিতনার স্থল এবং আকাংখার স্থান। তাই নারীর উপর ওয়াজেব, যারা তার মাহরাম (অগম্য পুরুষ) নয়, তাদের চোখে তার চেহারাকে আবৃত করা। কিন্তু যারা মাথা, গর্দান, বুক, পা, পদনালী এবং বাহু ঢাকাকেই শরয়ী পর্দা মনে করে, আর নারীর জন্য তার চেহারা ও করতলদ্বয়কে বের করে রাখাকে বৈধ ভাবে তাদের অভিমত নেহাতই আশ্চর্যজনক। যেহেতু বিদিত যে, কামনা ও বিপত্তির স্থল চেহারাই। তাহলে কিরূপে বলা সম্ভব যে,

শরীয়ত নারীকে তার পা উন্মুক্ত করতে নিষেধ করে এবং চেহারা খুলে রাখতে বৈধ করে! পরস্পর-বিরোধিতা থেকে পবিত্র প্রজ্ঞাপূর্ণ যুক্তিযুক্ত মহৎ শরীয়তে এটা বাস্তব হওয়া সম্ভবই নয়। পক্ষান্তরে প্রত্যেক মানুষই জানে যে, পা খুলে রাখার ফলে ঘটিতব্য ফিতনার চেয়ে চেহারা খুলে রাখার ফলে ঘটিতব্য ফিতনা বহু গুণে বড়। প্রত্যেক মানুষই জানে যে, নারীদের দেহে পুরুষদের কামনা ও আকাংখার স্থল মুখমন্ডলই। এই জন্যই কোন বিবাহ প্রস্তাবক বরকে (কোন নারীর পাণিপ্রার্থী পুরুষকে) যদি বলা হয় যে, তোমার প্রার্থিত কনে চেহারায় কুশ্রী কিন্তু পদযুগলে বড় সুশ্রী, তাহলে সে ব্যক্তি ওই কনের পাণি-প্রার্থনা করতে আর অগ্রসর হবে না। অন্যথায় যদি তাকে বলা হয় যে, সে চেহারায় সুন্দরী; কিন্তু তার হাত, করতল, পায়ের পাতা বা রলা দেখতে সুন্দর নয়, তাহলে নিশ্চয় সে তাকে বিবাহ করতে পিছপা হবে না। সুতরাং এখেকেও জানা গেল যে, চেহারাই অধিক আচ্ছাদনযোগ্য অঙ্গ।

তদনুরূপ আল্লাহর কিতাব, নবী ﷺ-এর সুন্নাহ, সাহাবাবর্গের বাণী এবং ইসলামের ইমাম ও ওলামাগণের উক্তি থেকে বহু এমন দলীল রয়েছে, যা নারীর জন্য তার গায়র মাহরাম (যাদের সহিত তার বিবাহ কোন কালে ও প্রকারে বৈধ এমন গম্য পুরুষ) থেকে সারা দেহ আবৃত করে পর্দা করা ওয়াজেব হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে। আর এ কথারও নির্দেশ করে যে, গায়র মাহরাম (গম্য পুরুষ) থেকে তার চেহারাকে গোপন করাও মহিলার পক্ষে ওয়াজেব। সে সমস্ত দলীলকে উল্লেখ করার স্থান এটা নয়। আর আল্লাহই অধিক জানেন।

(আসইলাতুম মুহিম্মাহ, শায়খ মুহাম্মদ বিন উসাইমীন, ২৮ পৃঃ)

হাত তালি দেওয়া ও শিস্ কাটা

প্রশ্ন ঃ- বিভিন্ন মহফিল ও সভাতে লোকেরা যে হাত তালি মারে ও শিস্ কাটে তা বৈধ কি ?

উত্তর ঃ- এ বিষয়ে অভিমত এই যে, বাহ্যতঃ যা মনে হয় তা এই আচরণ অমুসলিমদের নিকট হতে গৃহীত। এই জন্য তা মুসলিমদের প্রয়োগ করা বৈধ নয়। হ্যাঁ, যদি কোন বিষয় কোন মুসলিমকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করে তবে তার পরিপ্রেক্ষিতে সে তকবীর অথবা তসবীহ (আল্লাহু আকবার বা সুবহানাল্লাহ) পড়বে। তবে হ্যাঁ, জামাআতবদ্ধভাবে সমস্বরে পড়বে না-যেমন কিছু লোক করে থাকে। বরং প্রত্যেকে নিঃশব্দে বা একাকী পাঠ করবে। যেহেতু বিস্ময়ের সময় জামাআতবদ্ধভাবে সমস্বরে (না'রায়ে) তকবীর বা তসবীহ পাঠের (বৈধতার উপর) কোন ভিত্তি (বা দলীল) আমার জানা নেই।

(আসইলাতুম মুহিম্মাহ, শায়খ মুহাম্মদ বিন উসাইমীন, ২৯ পৃঃ)

গাঁটের নিচে কাপড় ঝুলানো

প্রশ্ন ঃ- বিনা অহংকারে পরিহিত বস্ত্র গাঁটের নিচে ঝুলানো হারাম কি না ?

উত্তর ঃ- পুরুষদের জন্য পরিহিত বস্ত্র পায়ের গাঁটের নিচে ঝুলান হারাম, তাতে অহংকারের উদ্দেশ্য হোক অথবা অহংকারের উদ্দেশ্য না হোক। তবে যদি তা অহংকার প্রকাশের উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে তার শাস্তি অধিকতর কঠিন ও বড়। যেহেতু সহীহ মুসলিমের আবু যার্র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে নবী ﷺ বলেন, "তিন ব্যক্তির সহিত কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে।" আবু যার্র ﷺ বলেন, 'তারা কারা ? হে আল্লাহর রসূল! তারা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হোক।' তিনি বললেন, "গাঁটের নিচে যে কাপড় ঝুলায়, কিছু দান করে 'দিয়েছি' বলে অনুগ্রহ প্রকাশকারী এবং মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্যদ্রব্য বিক্রেতা।" *(মুসলিম ১০৬নং ও আসহা-বুস সুনান)*

এই হাদীসটি অনির্দিষ্ট। কিন্তু তা ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীস দ্বারা নির্দিষ্ট, যাতে নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি অহংকারে তার কাপড় (মাটিতে) ছেঁচড়ায় তার দিকে আল্লাহ তাকিয়ে দেখবেন না।" *(বুখারী ৫৭৮৪নং,*

মুসলিম ২০৮-৫নং) সুতরাং আবু যার্রের হাদীসে অনির্দিষ্ট উক্তি ইবনে উমরের হাদীস দ্বারা নির্দিষ্ট হবে। যদি অহংকার সহ কাপড় লটকায় তাহলে আল্লাহ তার প্রতি দেখবেন না, তাকে পবিত্র করবেন না এবং তার জন্য হবে কষ্টদায়ক আযাব। আর এই শাস্তি সেই শাস্তি অপেক্ষাও বৃহত্তর যে শাস্তি নিরহংকারের সাথে গাঁটের নিচে লুঙ্গি নামিয়ে থাকে এমন ব্যক্তির হবে; যে ব্যক্তি প্রসঙ্গে নবী ﷺ বলেন, গাঁটের নিচের লুঙ্গি জাহান্নামে।" *(বুখারী ৫৭৮-৭নং ও আহমদ ২/৪১০)* অতএব শাস্তি যখন পৃথক পৃথক হল, তখন অনির্দিষ্টকে নির্দিষ্টের উপর আরোপ করা অসঙ্গত হবে। কারণ অনির্দিষ্টকে নির্দিষ্টের উপর আরোপ করার নিয়মে শর্ত এই যে, উভয় দলীলের নির্দেশ অভিন্ন হবে। কিন্তু যদি নির্দেশ ভিন্ন হয় তবে এককে অপরের সহিত নির্দিষ্ট করা যাবে না। এই জন্যই তায়াম্মুমের আয়াতকে যাতে আল্লাহ বলেন, "এবং উহা তোমাদের মুখে ও হাতে বুলাবে।" অযুর আয়াত দ্বারা নির্দিষ্ট করি না, যাতে আল্লাহ বলেন, "তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে।" *(সূরা মায়েদাহ ৬ আয়াত)* সুতরাং তায়াম্মুম (মাসাহ করা) হাতের কনুই পর্যন্ত হবে না। (যদিও ওযুতে হাতের কনুই পর্যন্ত ধুতে হয়।)

ইমাম মালেক প্রভৃতিগণ যা আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণনা করেছেন তা এই কথার প্রতিই নির্দেশ করে। যাতে নবী ﷺ বলেন, "মুমিনদের লুঙ্গি তার অর্ধ পদনালী (হাঁটু হতে গোড়ালি পর্যন্ত পায়ের অংশ বা ঠ্যাং) পর্যন্ত। আর গাঁটের নিচে যা হবে তা দোযখে হবে। আর যে ব্যক্তি অহংকারের সাথে তার পরিহিত লেবাস (লুঙ্গি, প্যান্ট, পায়জামা, ধুতি, কামীস ইত্যাদি) মাটির উপর ছেঁচড়ে নিয়ে বেড়ায় তার প্রতি আল্লাহ (তাকিয়েও) দেখবেন না।" অতএব নবী ﷺ একই হাদীসে দুটি উদাহরণ পেশ করেন এবং উভয়ের শাস্তি পৃথক হওয়ার কারণে উভয়ের নির্দেশের ভিন্নতাও বিবৃত করেন। সুতরাং উক্ত দুইজন কর্মে ভিন্ন, নির্দেশে ভিন্ন এবং শাস্তিতেও পৃথক। এই থেকে তাদের ভুল স্পষ্ট হয় যারা তাঁর উক্তি (গাঁটের নিচে যা তা দোযখে)কে (যে ব্যক্তি অহংকারের সহিত

তার কাপড় ছেঁচড়ে বেড়ায় তার প্রতি আল্লাহ তাকাবেন না) এই উক্তি দ্বারা নির্দিষ্ট করে।

আবার কতক মানুষ আছে যাদেরকে গাঁটের নিচে লুঙ্গি বা প্যান্ট ঝুলাতে নিষেধ করলে বলে, 'আমি অহংকারের উদ্দেশ্যে ঝুলাইনি তো।'

কিন্তু আমরা তাদেরকে বলি যে, গাঁটের নিচে কাপড় ঝুলানো দুই প্রকার; প্রথম প্রকার- যার শাস্তি, মানুষকে কেবল সেই স্থানে আযাব দেওয়া হবে যে স্থানে সে (শরীয়তের) অন্যথাচরণ ও অবাধ্যতা করে এবং তা হচ্ছে গাঁটের নিচের অংশ যার উপর নিরহংকারে কাপড় ঝুলায়। অতএব এ ব্যক্তিকে কেবল অবাধ্যতার অঙ্গে শাস্তি দেওয়া হবে। অর্থাৎ যাতে অবাধ্যতা বা অন্যথাচরণ করছে কেবল তার বদলায় তাকে জাহান্নামে আযাব দেওয়া হবে, আর তা হচ্ছে যা গাঁটের নিচে নামে। কিন্তু এই অবাধ্যাচারীর এই শাস্তি হবে না যে, তার প্রতি আল্লাহ তাকাবেন না এবং তাকে পবিত্র করবেন না। (কারণ, তার অহংকার নেই।) আর দ্বিতীয় প্রকার শাস্তি; কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার সহিত কথা বলবেন না, তার প্রতি তাকাবেন না, তাকে পবিত্র করবেন না এবং তার জন্য যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি হবে- আর এটা তার জন্য হবে, যে তার পরিহিত বস্ত্রকে পায়ে গাঁটের নিচে অহংকারের সাথে মাটিতে ছেঁচড়ে নিয়ে বেড়ায়। এরূপই তাকে বলি। আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর বংশধর ও সাহাবাবর্গের উপর করুণা ও শান্তি বর্ষণ করুন।

(আসইলাহ মুহিম্মাহ, শায়খ মুহাম্মদ বিন আল উসাইমীন, ২৯ পৃঃ)

তাস ও দাবা খেলা

প্রশ্ন ঃ- তাস ও দাবা খেলা বৈধ কি ?

উত্তর ঃ- ওলামাগণ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, উভয় প্রকার খেলাই হারাম। আল্লাহ তাঁদের প্রতি করুণা করুন। যেমন আমাদের শায়খ ও ওস্তাদগণও তা উল্লেখ করেছেন। এই সিদ্ধান্তের কারণ এই যে, উভয় খেলাতে

মানুষের মধ্যে বহু ঔদাস্য এবং আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার যিক্র ও স্মরণে বাধা সৃষ্টি হয়। আবার কখনো কখনো উভয় খেলাই খেলোয়াড়দের মধ্যে শত্রুতা ও দ্বেষের কারণ হয়। পরন্তু অনেক ক্ষেত্রে ঐ সব খেলাতে অর্থের বাজিও রাখা হয়। আর এ কথা বিদিত যে, প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার উপর কোন পণ বা বাজি রাখা বৈধ নয়। তবে যে প্রতিযোগিতায় বাজি রাখায় শরীয়ত অনুমতি দিয়েছে তাতে রাখা চলে এবং তা মাত্র তিনটি প্রতিযোগিতা ; তীর, উঁট ও ঘোড়া প্রতিযোগিতা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তাস ও দাবা খেলার খেলোয়াড়দের অবস্থা চিন্তা করে সে বুঝতে পারে যে, তারা তাতে কত বেশী সময় নষ্ট করে; যার সমস্তই আল্লাহর আনুগত্যের বাইরে এবং তাদের নিজস্ব কোন পার্থিব উপকার লাভ ছাড়াই তা অতিবাহিত করে ফেলে।

আবার কিছু লোক বলে থাকে যে, তাস ও দাবা খেলায় নাকি ব্রেন খুলে এবং বুদ্ধি বাড়ে। কিন্তু বাস্তব তাদের দাবীর অন্যথায়। বরং ঐ সব খেলা ব্রেনকে ভোঁতা করে এবং এই প্রকার বুদ্ধিতেই ব্রেনকে সীমাবদ্ধ করে রাখে। তাই যদি কেউ তার চিন্তাশক্তিকে উক্ত পদ্ধতি ছাড়া অন্যভাবে (ভিন্ন বিষয়ে) ব্যবহার করে, তবে সে কিছু ফল লাভ করতে পারঙ্গম হয় না।

অতএব এই কথার উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, যে খেলা ব্রেনকে ভোঁতা করে এবং তাকে এই প্রকার বুদ্ধিতেই সীমিত করে রাখে সেই খেলা থেকে জ্ঞানী মানুষকে দূরে থাকা আবশ্যক।

(আসইলাতুম মুহিম্মাহ, শায়খ মুহাম্মদ বিন উসাইমীন, ১৮ পৃঃ)

ধূমপান করা ও তা বিক্রয় করা

প্রশ্ন ঃ- ধূমপান করা ও তা বিক্রয় করা বৈধ কি ?

উত্তর ঃ- ধূমপান ([5]) করা হারাম। অনুরূপ তা ক্রয় করা ও বিক্রয় করা এবং যে তা বিক্রয় করে তাকে দোকান ভাড়াতে দেওয়াও হারাম। ([6]) যেহেতু এতে পাপ ও সীমালংঘনে সহায়তা করা হয়।

ধূমপান হারাম হওয়ার দলীল এই যে, আল্লাহ তাআলা বলেন,

(وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَاماً...)

অর্থাৎ, আর নির্বোধদেরকে তোমাদের সম্পদ অর্পণ করো না -যা আল্লাহ তোমাদের জন্য উপজীবিকা করেছেন।” *(সূরা নিসা ৫ আয়াত)*

উক্ত আয়াত হতে ধূমপান হারাম এইভাবে প্রমাণিত হয় যে, নির্বোধদের হাতে মাল বা অর্থ দিতে আল্লাহ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। কারণ নির্বোধ তা অনর্থক ও অযথাভাবে ব্যয় করে থাকে। আর আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন যে, এ সমস্ত অর্থ ও সম্পদ মানুষের ইহকাল ও পরকালের স্বার্থের জন্য তার উপজীবিকা। কিন্তু সে অর্থ ধূমপানে ব্যয় করা দ্বীনী স্বার্থের এবং পার্থিব স্বার্থের মধ্যেও পরিগণিত নয়। সুতরাং তা ঐ পথে ব্যয় করা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সম্পদ যেভাবে খরচ করতে নির্দেশ দিয়েছেন তার পরিপন্থী। তদনুরূপ এর অবৈধতার দলীল এই যে, আল্লাহ তাআলা বলেন,

(وَلاَ تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ) অর্থাৎ, তোমরা আত্মহত্যা করো না।” *(সূরা নিসা ২৯আয়াত)*

এই আয়াত থেকে অবৈধতা এই রূপে প্রমাণিত হয় যে, চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে ধূমপান কঠিন রোগের -যেমন ক্যানসারের কারণ; যা ধূমপায়ীকে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর করে সে কথা প্রমাণিত। অতএব ধূমপায়ী ধূমপান করে নিজেকে

([5]) *চুরুট, বিড়ি, সিগারেট, হুঁকা, গাঁজা প্রভৃতি তামাকের ধোঁয়া সেবন। -অনুবাদক*

([6]) *তদনুরূপ ধূমপান সামগ্রী প্রস্তুত করা ও তার মাধ্যমে অর্থোপার্জন করাও অবৈধ।-অনুবাদক*

ধ্বংস করার কারণের নিকটবর্তী করে। (অথচ আল্লাহ নিজেকে ধ্বংস করতে নিষেধ করেছেন।)

হারাম হওয়ার দলীল আরো এই যে, আল্লাহ তাআলা বলেন,

(وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلاَ تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ)

অর্থাৎ, আর তোমরা খাও ও পান কর এবং অপব্যয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপব্যয়ীদের পছন্দ করেন না। *(সূরা আ'রাফ ৩১ আয়াত)*

উক্ত আয়াত দ্বারা অবৈধতা এইভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাআলা যখন আমাদেরকে বৈধ পানাহারে অপব্যয় করতে নিষেধ করেছেন (অর্থাৎ তাতে সীমা অতিক্রম করতে মানা করেছেন) তখন যে বিষয়ে কোন লাভ ও উপকার নেই (বরং ক্ষতি ও অপকার আছে) তাতে অর্থ ব্যয় করা অধিক নিষেধযোগ্য হবে।

ধূমপান অবৈধতার আরো দলীল রসূল ﷺ-এর সেই হাদীস, যাতে তিনি মাল নষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ধূমপানের সামগ্রী ক্রয় করতে অর্থ ব্যয় করা মাল নষ্ট করার পর্যায়ভুক্ত। যেহেতু যাতে কোন লাভ নেই তাতে অর্থ ব্যয় করা নিঃসন্দেহে তা বিনষ্ট করারই অপর নাম। এতদ্ব্যতীত আরো অন্যান্য দলীল রয়েছে। কিন্তু জ্ঞানীর জন্য আল্লাহর কিতাব অথবা তাঁর নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর সুন্নাহ থেকে একটি মাত্র দলীলই যথেষ্ট।

পক্ষান্তরে সেই শুদ্ধ মতাদর্শ যা ধূমপানের অবৈধতার প্রতি নির্দেশ করে তা এই যে, কোন জ্ঞানী দ্বারা এমন বস্তু ভক্ষণ করা অসম্ভব যা তার ক্ষতি বা ব্যাধির কারণ হয় এবং তাতে অর্থ ব্যয় করে তার সম্পদের ধ্বংস অবধার্য হয়। যেহেতু জ্ঞানীর জন্য তার স্বাস্থ্য ও সম্পদের যত্ন ও হিফাযত করা আবশ্যক। তাই যার জ্ঞান ও বিবেক অসম্পূর্ণ সে ব্যক্তি ছাড়া প্রকৃত ও পূর্ণ জ্ঞানী ব্যক্তি এ দুয়ে অযত্ন ও অবহেলা করে না।

জ্ঞানতথ্যে ও অন্তর্দৃষ্টিকোণে ধূমপান অবৈধ হওয়ার দলীল এটাও যে, ধূমপায়ী যখন ধূমপানের কোন সামগ্রী না পায় তখন তার মনে সংকীর্ণতা অনুভব করে, তার অন্তরে ব্যাকুলতা ও দুশ্চিন্তার আধিক্য এসে ভীড় জমায়, আর পুনরায় তা পান না করা পর্যন্ত তার মনে স্ফূর্তি ও স্বস্তি ফিরে আসে না।

বিবেক ও যুক্তির কষ্টিপাথরে দলীল এও যে, ধূমপান করার কারণে ধূমপায়ীর নিকট ইবাদত ভারী মনে হয়; বিশেষ করে রোযা। যেহেতু ধূমপায়ী রোযাকে খুবই ভারী মনে করে থাকে। কারণ রোযা রাখাতে উষার উদয়কালের পরমুহূর্ত থেকে পুনরায় সূর্যাস্ত পর্যন্ত সে ধূমপান থেকে বঞ্চিত থাকে। আবার কখনো রোযা গ্রীষ্মের দীর্ঘ দিনসমূহে হলে তা তার নিকট আরো অধিক অপছন্দনীয় হয়।

তাই এই পরিস্থিতিতে আমি আমার মুসলিম ভ্রাতৃবর্গকে সাধারণভাবে এবং ধূমপানে অভ্যস্ত ব্যক্তিবর্গকে বিশেষভাবে ধূমপান হতে দূরে থাকতে, ধুমপান সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়, তা ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য দোকান ভাড়া দেওয়া এবং তাতে কোন প্রকারের সাহায্য সহায়তা করা থেকে সাবধান হতে উপদেশ দিচ্ছি।

(আসইলাতুম মুহিম্মাহ, ইবনে উসাইমীন, ১৪ পৃঃ)

অবৈধ কর্মে দোকান ভাড়া দেওয়া

প্রশ্ন ঃ- ধূমপান ও গান-বাজনার সামগ্রী, অশ্লীল ও নোংরা ভিডিও ক্যাসেট বিক্রেতাকে দোকান ভাড়া দেওয়া এবং সুদী ব্যাঙ্কের জন্য ইমারত ভাড়া দেওয়া বৈধ কি ?

উত্তর ঃ- এই সব কাজে ইমারত বা দোকান ভাড়া দেওয়ার বৈধতা বা অবৈধতা আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণী হতে জানা যায়; তিনি বলেন,

(وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)

অর্থাৎ, সৎকাজ ও তাকওয়ায় (আল্লাহভীরুতা ও আত্মসংযমে) তোমরা একে অপরকে সাহায্য কর এবং অসৎকাজ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করো না।” *(সূরা মায়েদাহ ২ আয়াত)*

এই কথার ভিত্তিতে প্রশ্নে উল্লেখিত উদ্দেশ্যে ইমারত বা দোকানাদি ভাড়া দেওয়া হারাম। যেহেতু ঐ সব (অবৈধ) কাজে নিজের ঘর ভাড়া দিলে পাপ ও অন্যায় কাজে অপরকে সহায়তা করা হয় (যা নিষিদ্ধ)।

(আসইলাতুম মুহিম্মাহ, ইবনে উসাইমীন, ১৪ পৃঃ)

তর্কপণ

প্রশ্ন ঃ- কিছু লোক তর্কের উপর বাজি রাখে এবং তা বৈধ মনে করে থাকে; কিন্তু আসলে তা বৈধ কি ?

উত্তর ঃ- তর্কের উপর পণ রাখা বহু লোকের নিকট বিদিত। তা এই রূপে হয় যে, দুই ব্যক্তি কোন বিষয়ে মতভেদ করে তর্কের সাথে বলে ,‘আমি যা বলছি তা যদি সত্য বা সঠিক হয়, তাহলে তোমাকে এই এই লাগবে।’ এবং যা লাগবে তার নাম নেয়। (অর্থাৎ এত মিষ্টি খাওয়াতে হবে বা এত পয়সা দিতে হবে ইত্যাদি বলে)। ‘আর তুমি যা বলছ তা যদি সত্য বা সঠিক হয়, তাহলে আমি এই এই দেব।’ এবং যা দেবে তার নাম নেয়। এরূপ বাজি রাখা হারাম। কারণ এ কাজ জুয়ার পর্যায়ভুক্ত, যাকে আল্লাহ তাআলা মদের পাশাপাশি উল্লেখ করে বলেছেন,

(يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ، إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي

الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ)

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য-নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর। এতে তোমরা সফলকাম হতে পারবে। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে ও নামাযে বাধা দিতে চায়। অতএব তোমরা কি নিবৃত্ত হবে?” *(সূরা মা-য়েদাহ ৯০-৯১ আয়াত)*

এই ভিত্তিতে উক্ত প্রকার জুয়াবাজি অবৈধ। কিছু লোকের তাকে ন্যায় বলা তার নিকৃষ্টতাকে অধিক বৃদ্ধি করে। যেহেতু সে অন্যায়কে ন্যায় সাব্যস্ত করে এবং তার আসল নাম ত্যাগ করে ভিন্ন নামকরণ করে আর তার উপর বৈধতার রং চড়িয়ে দেয়, ফলে সে যা দাবী করে তাতে মিথ্যুক প্রমাণিত হয়, যা ব্যক্ত করে তাতে সে প্রতারক প্রতীয়মান হয়।

আল্লাহর নিকট আমরা নির্বিঘ্নতা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করি।

(আসইলাতুম মুহিম্মাহ, ইবনে উসাইমীন, ১৪ পৃঃ)

দাড়ি চাঁছা ও ছাঁটা

প্রশ্ন ঃ- দাড়ি চাঁছা ও ছাঁটা বৈধ কি ? এর সীমা কতটুকু ?

উত্তর ঃ- দাড়ি চাঁছা হারাম। যেহেতু তাতে মুশরিক ও অগ্নিপূজক (মাজুস)দের সাদৃশ্য অবলম্বন করা হয়। অথচ নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করে সে তাদেরই দলভুক্ত।” *(আহমদ ২/৫০, আবু দাউদ ৪০৩১নং, হাদীসটিকে আলবানী সহীহ বলেছেন।)* আর যেহেতু তাতে আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন করা হয় যা শয়তানের আদেশ (পালন)। আল্লাহ তাআলা (শয়তানের প্রতিজ্ঞা উদ্ধৃত করে) বলেন,

(وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ)

অর্থাৎ, আর আমি তাদেরকে নিশ্চয় নির্দেশ দেব, যাতে তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবেই।” *(সূরা নিসা ১১৯ আয়াত)*

আর যেহেতু তাতে সেই প্রকৃতি বিনাশ করা হয়, যে প্রকৃতির উপর আল্লাহ সৃষ্টিকে সৃজন করেছেন। কারণ দাড়িকে (নিজের অবস্থায়) বর্জন করা প্রকৃতিগত নিয়মের পর্যায়ভুক্ত। যেহেতু (দাড়ি চাঁছা) আল্লাহর নেক বান্দা নবী, রসূল এবং তাঁর অনুবর্তীগণের আদর্শ ও হেদায়াতের পরিপন্থী। যেমন নবী ﷺ-এর চওড়া ও ঘন (চাপ) দাড়ি ছিল। আল্লাহ তাআলা হারূন ﷺ প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর ভাই মূসা ﷺ-কে বললেন,

(قَالَ يَبْنَؤُمَّ لاَ تَأْخُذْ بِلِحْيَتِيْ وَلاَ بِرَأْسِيْ)

অর্থাৎ, হে আমার সহোদর! আমার শ্মশ্রু ও কেশ ধরে আকর্ষণ করো না।” *(সূরা ত্বাহা ৯৪ আয়াত)*

সুতরাং তা চেঁছে ফেলা আল্লাহর নেক বান্দা, নবী, রসূল ও অন্যান্যদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়া।

দাড়ি চাঁছা নবী ﷺ-এর আদেশের অবাধ্য আচরণ। যেহেতু তিনি বলেন, “দাড়ি ছেড়ে দাও।” *(বুখারী ৫৮৯৩নং, মুসলিম২৫৯নং)* “দাড়ি বাড়াও।” “দাড়ি (নিজের অবস্থায়) বর্জন কর।” সুতরাং এসব উক্তি এই কথাই প্রমাণ করে যে, যে ব্যক্তি দাড়ির কিছু পরিমাণও ছাঁটবে সে নবী ﷺ-এর অবাধ্যতায় আপতিত হবে। আর যে ব্যক্তি নবী ﷺ-এর আদেশের অবাধ্য হয় সে আল্লাহর অবাধ্য। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন, **(مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ)**

অর্থাৎ, যে রসূলের অনুসরণ করে সে তো আসলে আল্লাহরই আনুগত্য করে।” *(সূরা নিসা ৮০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

(وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيْناً)

অর্থাৎ, এবং যে আল্লাহ ও তার রসূলকে অমান্য করে সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হয়।" *(সূরা আহযাব ৩৬ আয়াত)*

আপনি এক সম্প্রদায় মুসলিমের ব্যাপারে আশ্চর্যান্বিত হবেন, যারা দাড়ি চাঁছাকে হালাল মনে করে অথচ তারা জানে যে, তা মুসলিমদের এক প্রতীক এবং রসূলগণের অন্যতম আদর্শ। আর এ কথাও জানে যে, নবী ﷺ তা নিজের অবস্থায় ছেড়ে দিতে আদেশ করেছেন। ([7]) কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও মুমিনদের মত ও পথের বিরুদ্ধাচরণ করে তা চেঁছে ফেলাকে তারা হালাল মনে করে।

দাড়ির সীমা ; দুই গন্ড ও তার পার্শ্বদ্বয় এবং চিবুকের লোমকে দাড়ি বলা হয়; যেমন আভিধানিকদের কথা এটাই প্রমাণ করে। আর নবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা দাড়ি বৃদ্ধি কর।" কিন্তু দাড়িকে কোন শরয়ী সীমায় সীমাবদ্ধ করেননি। আর যখন দলীল বা উক্তি আসে অথচ তার কোন শরয়ী সীমা থাকে না তখন তাকে আভিধানিক সীমায় আরোপ করা হয়। যেহেতু নবী ﷺ আরবী ভাষায় কথা বলতেন এবং কুরআনও আরবী।

(আসইলাতুম মুহিম্মাহ, শায়খ মুহাম্মদ বিন উসাইমীন, ১৯ পৃ)

অভিসম্পাত

প্রশ্ন ঃ- এক মহিলার অভ্যাস যে, সে তার সন্তানদেরকে অভিশাপ ও গালিমন্দ করে থাকে। কখনো বা তাদেরকে প্রত্যেক ছোট বড় দোষে কথা দ্বারা, কখনো বা প্রহার করে কষ্ট দেয়। এই অভ্যাস থেকে ফিরে আসতে আমি তাকে একাধিকবার উপদেশ দিয়েছি। কিন্তু সে উত্তরে বলেছে, 'তুমিই ওদের স্পর্ধা বাড়ালে অথচ ওরা কত দুষ্ট।' শেষে ফল এই দাঁড়াল যে, ছেলেরা তাকে অবজ্ঞা করে তার কথা নেহাতই অগ্রাহ্য করতে লাগল। তারা বুঝে নিল যে শেষ পরিণাম তো গালি ও প্রহার।

([7]) *তাই দাড়ি ছাড়া সুন্নত নয় বরং ওয়াজেব। -অনুবাদক*

এই স্ত্রীর ব্যাপারে আমার ভূমিকা কি হতে পারে? এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে দ্বীনের নির্দেশ কি? যাতে সে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। আমি কি তাকে তালাক দিয়ে দূরে সরে যাব এবং সন্তানরা তার সঙ্গে থাকবে? অথবা আমি কি করব? এ বিষয়ে পথ-নির্দেশ করে আমাকে উপকৃত করুন। আল্লাহ আপনাকে তওফীক দিন।

উত্তর ঃ- ছেলে-মেয়েদেরকে অভিসম্পাত করা অন্যতম কাবীরাহ গোনাহ; অনুরূপ অন্যান্যদেরকেও অভিশাপ করা যারা এর উপযুক্ত নয়। নবী ﷺ হতে শুদ্ধভাবে প্রমাণিত যে, তিনি বলেন, "মুমিনকে অভিশাপ করা তাকে হত্যা করার সমান।"

তিনি আরো বলেন, "অভিসম্পাতকারীরা কিয়ামতের দিন সাক্ষী ও সুপারিশকারী হতে পারবে না।"

সুতরাং ঐ মহিলাকে তওবা করা ওয়াজেব এবং ছেলে-মেয়েদেরকে গালি-মন্দ করা থেকে তার জিভকে হিফাযত করা আবশ্যিক। তাদের জন্য সৎপথ-প্রাপ্তি ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে অধিক অধিক দুআ করা তার পক্ষে বিধেয়।

আর হে গৃহস্বামী! তোমার জন্য বিধেয়, স্ত্রীকে সর্বদা নসীহত করা ও সন্তানদেরকে অভিশাপ করা থেকে তাকে সাবধান করা। যদি নসীহত লাভদায়ক না হয়, তবে বিচ্ছিন্নতা (কথা না বলা, শয্যাত্যাগ করা ইত্যাদি) অবলম্বন করবে - সেই বিচ্ছিন্নতা বড় ধৈর্যের সাথে ও সওয়াবের আশা রেখে অবলম্বন করবে; যা তাতে ফলদায়ক বলে বিশ্বাস করবে। আর তালাক দেওয়াতে অবশ্যই জলদিবাজি করবে না।

আমরা আল্লাহর নিকট তোমার ও আমার জন্য সুপথ প্রার্থনা করি। আর এর সাথে যেন সন্তান-সন্ততিকে আদব দান এবং কল্যাণের প্রতি দিগ্‌দর্শন করি, যাতে তাদের আচরণ সুন্দর হয়ে উঠে।

(ফাতাওয়া কিতা-বিদ দা'ওয়াহ, শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায, ১/১৯৫)

গর্ভিণী প্রেমিকাকে বিবাহ

প্রশ্ন ঃ- এক ব্যক্তি এক কুমারীর সহিত (প্রেম করে) ব্যভিচার করেছে, এখন সে তাকে বিবাহ করতে চায়। এটা কি তার জন্য বৈধ ?

উত্তর ঃ- যদি বাস্তবে তাই হয়ে থাকে, তাহলে ওদের প্রত্যেকের উপর আল্লাহর নিকট তওবা করা ওয়াজেব; এই নিকৃষ্টতম অপরাধ হতে বিরত হবে, অশ্লীলতায় পড়ার ফলে যা ঘটে গেছে তার উপর খুব লজ্জিত হবে, এমন নোংরামীর পথে পুনরায় পা না বাড়াতে দৃঢ়সংকল্প হবে এবং অধিক অধিক সৎকাজ করবে। সম্ভবতঃ আল্লাহ উভয়কে ক্ষমা করে দেবেন এবং তাদের পাপসমূহকে পুণ্যে পরিণত করবেন। যেমন তিনি বলেন,

(وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ إِلَهاً آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَاناً، إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَّكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَّحِيْماً، وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوْبُ إِلَى اللهِ مَتَاباً)

অর্থাৎ, এবং যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য উপাস্যকে আহবান করে না, আল্লাহ যাকে যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে হত্যা নিষেধ করেছেন তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এগুলি করে তারা শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন ওদের শাস্তিকে দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে তারা হীন অবস্থায় স্থায়ী হবে। তবে তারা নয়, যারা তওবা করে, (পূর্ণ) ঈমান এনে সৎকাজ করে, আল্লাহ ওদের পাপরাশীকে পুণ্যে পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যে ব্যক্তি তওবা করে ও সৎকাজ করে সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অভিমুখী হয়। *(সূরা ফুরক্বান ৬৮-৭১ আয়াত)*

আর ঐ ব্যক্তি যদি ঐ কুমারীকে বিবাহ করতে চায় তাহলে বিবাহ বন্ধনের পূর্বে এক মাসিক দেখে তাকে (গর্ভবতী কি না তা) পরীক্ষা করে নেবে। যদি (মাসিক না হয় এবং) তার গর্ভ প্রকাশ পায়, তাহলে তার বিবাহ বন্ধন ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সন্তান প্রসব করেছে। যেহেতু রসূল ﷺ অপরের ফসলকে নিজের পানি দ্বারা সিঞ্চিত (অর্থাৎ গর্ভবতী নারীকে বিবাহ করে সঙ্গম) করতে নিষেধ করেছেন। *(আবু দাউদ)*

(লাজনাহ দা-য়েমাহ, মাজাল্লাতুল বহূসিল ইসলামিয়্যাহ ৯/৭২)

(শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উসাইমীন)

তওবা ঃ- আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে তাঁর আনুগত্যের প্রতি প্রত্যাবর্তনকে বলে।

তওবা ঃ- আল্লাহ আয্যা অ জাল্লার প্রিয়। "আল্লাহ তওবাকারিগণকে এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরকে পছন্দ করেন।" *(সূরা বাকারাহ ২২২আয়াত)*

তওবা ঃ- প্রত্যেক মুমিনের উপর ওয়াজেব। "হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা কর -বিশুদ্ধ তওবা।" *(সূরা তাহরীম ৮-আয়াত)*

তওবা ঃ- সাফল্যের কারণসমূহের অন্যতম কারণ। "আর তোমরা সকলে আল্লাহর নিকট তওবা কর -হে ঈমানদারগণ! যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" *(সূরা নূর ৩১আয়াত)*

আর সফলতা এই যে, মানুষ নিজের অভীষ্ট বস্তু লাভ করবে এবং অবাঞ্ছিত বস্তু থেকে নিষ্কৃতি পাবে।

তওবা ঃ- বিশুদ্ধভাবে করলে আল্লাহ এর দ্বারায় পাপ ক্ষমা করেন, তাতে পাপ যত বড় আর যত বেশীই হোক না কেন। "ঘোষণা করে দাও (আমার এ কথা), হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছ-

আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না; আল্লাহ সমুদয় পাপরাশিকে ক্ষমা করে দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(সূরা যুমার ৫৩আয়াত)*

হে ভাই অপরাধী! খবরদার তোমার প্রতিপালকের রহমত (করুণা) থেকে নিরাশ হয়ো না, যেহেতু তওবার দরজা উন্মুক্ত -যতদিন পর্যন্ত না পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয় হয়েছে। নবী ﷺ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ রাত্রিকালে স্বহস্ত প্রসারিত করেন যাতে দিবাকালের অপরাধী তওবা করে এবং দিবাকালেও স্বহস্ত প্রসারিত করেন যাতে রাত্রিকালের অপরাধী তওবা করে -যতক্ষণ পর্যন্ত না পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হয়েছে। *(মুসলিম ২৭৫৯নং)*

কত শত বহু সংখ্যক বড় বড় পাপীর নিজ পাপ থেকে তওবাকারীর তওবা আল্লাহ কবুল করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

(وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ إِلَهاً آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَاناً، إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَّكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَّحِيْماً، وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوْبُ إِلَى اللهِ مَتَاباً)

অর্থাৎ, আর যারা আল্লাহর সঙ্গে কোন অন্য উপাস্যকে অংশী করে (ডাকে) না, আল্লাহ যাকে যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এগুলি করে তারা শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন ওদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে তারা হীন অবস্থায় চিরস্থায়ী হবে। তবে তারা নয়, যারা তওবা করে এবং সৎকাজ করে, আল্লাহ তাদের পাপসমূহকে পুণ্যে পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" *(সূরা ফুরক্বান ৬৮-৭০ আয়াত)*

বিশুদ্ধ তওবা ঃ- তখন হয়, যখন তাতে পাঁচটি শর্ত পূর্ণ হয় ;

প্রথমঃ- আল্লাহর উদ্দেশ্যেই বিশুদ্ধ-চিত্ত হয়ে তওবা করা। এর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি, তাঁর নিকট সওয়াব এবং তাঁর আযাব থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আশা রাখা।

দ্বিতীয় ঃ- পাপ ও অবাধ্যতা কর্মের উপর লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হওয়া। যা করে ফেলেছে তার উপর দুঃখিত ও বেদনাহত হওয়া এবং 'যদি তা না করত' -এই আক্ষেপে অনুতপ্ত হওয়া।

তৃতীয় ঃ- সত্বর পাপ থেকে বিরত হওয়া। যদি সেই পাপ আল্লাহ তাআলার অধিকারভুক্ত কোন হারাম কর্মে লিপ্ত হয়ে হয়, তবে পাপী তা পরিত্যাগ করবে, আর যদি কোন ওয়াজেব কর্ম ত্যাগ করে হয় তবে সত্বর তা পালন করতে শুরু করবে। যদি ঐ পাপ কোন সৃষ্টির অধিকারভুক্ত হয় তবে সত্বর তা হতে মুক্তিলাভ করতে চেষ্টিত হবে। (অন্যায় ভাবে কিছু গ্রহণ করে থাকলে যার অধিকার হরণ করেছে) তাকে তা ফেরৎ দিয়ে অথবা তার নিকট থেকে ক্ষমা চেয়ে এবং তাতে বৈধতার অধিকার চেয়ে আপন করে নেবে।

চতুর্থ ঃ- ভবিষ্যতে পুনরায় ঐ পাপে লিপ্ত না হওয়ার উপর দৃঢ় সংকল্প ও প্রতিজ্ঞা করা।

পঞ্চম ঃ- মৃত্যু উপস্থিত কালে অথবা পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয় হয়ে তওবা করার নির্দিষ্ট সময় অবসান হওয়ার পরে তওবা না করা (অর্থাৎ এর পূর্বে করা) আল্লাহ তাআলা বলেন,

(وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّيْ تُبْتُ الآنَ)

অর্থাৎ, তাদের জন্য তওবা নয় যারা (আজীবন) মন্দ কাজ করে অতঃপর তাদের কারো নিকট যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, 'আমি এখন তওবা করলাম।" *(সূরা নিসা ১৮ আয়াত)*

আর নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের পূর্বে তওবা করবে আল্লাহ তার তওবা গ্রহণ করে নেবেন।" *(মুসলিম ২৭০৩নং)*

পরিশেষে

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! নিম্নলিখিত কর্মাবলী করতে সচেষ্ট হন ঃ-

❖ তওহীদকে বাস্তবায়ন করুন এবং শির্ক, বিদআত ও অবাধ্যাচরণের ভেজাল হতে তা পরিশুদ্ধ করুন, তাহলেই বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবেন।

❖ যথা সময়ে বিনয় ও স্থিরতার সাথে নামায কায়েম করুন।

❖ আপনার অর্থ (টাকা-পয়সা), অলংকার ইত্যাদির যাকাত আদায় করুন।

❖ বিধেয় নিয়মানুসারে ফরয ও নফল রোযা পালন করুন ।

❖ যথা সম্ভব অতি নিকটবর্তী সময়ে ফরয হজ্জ পালন করুন।

❖ আপন নিকটাত্মীয় ও পিতা-মাতার নিকটাত্মীয়র মাঝে জ্ঞাতি-বন্ধন অক্ষুন্ন রাখুন।

❖ শুদ্ধ জ্ঞানভান্ডার ও ইলমের কিতাব ও সুন্নাহ এবং (সাহাবায়ে কোরাম, সলফে সালেহীন ও প্রকৃত অভিজ্ঞ) ওলামাদের উক্তি বই-পুস্তক ও ক্যাসেট থেকে জ্ঞান অন্বেষণ করুন।

❖ প্রজ্ঞা, যুক্তি, সদুপদেশ, সদ্ভাবে আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমে হিকমতের সাথে আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করুন।

❖ সাধ্যমত সৎকাজে আদেশ এবং মন্দকাজে বাধা দান করুন।

❖ সৎকর্মের মাধ্যমে সময় ও অবসরের সদ্ব্যবহার করে নিজে উপকৃত হন।

❖ সন্তান-সন্ততিকে সঠিক তরবিয়ত ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিন ।

❖ পশ্চাতে মুসলিমদের জন্য দুআ করুন।

- যথাসাধ্য কল্যাণমূলক কর্মে অংশ গ্রহণ করুন।
- প্রশংসনীয় চরিত্রে চরিত্রবান হন।
- অধিকাধিক ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা), তওবা এবং আল্লাহর যিক্‌র করুন।
- (সর্বদা) মরণ, হিসাব, জান্নাত ও জাহান্নামকে স্মরণ করুন।
- কোন পাপ করে ফেললে সাথে সাথে পুণ্যও করুন এবং মানুষের সাথে সদা সদ্ব্যবহার করুন।
- মুসলিমদের দোষ-ত্রুটি গোপন করুন এবং তাদের মান-সম্ভ্রম লুণ্ঠিত হলে প্রতিবাদ করুন।
- (আদর্শ) স্ত্রী হয়ে সৎকর্মে স্বামীর আনুগত্য করুন।

আর সাবধান হন

♣ কথায় ও কর্মে সর্বপ্রকার বিদ্‌আত থেকে।

♣ যথা সময় হতে নামায ঢিলে করা থেকে।

♣ নামাযে অস্থিরতা ও অমনোযোগিতা থেকে।

♣ (মহিলা হলে) টাইট-ফিট, আধা খোলা, ছোট বা খাট এবং নিচে থেকে উদম নগ্নপ্রায় পোশাক পরে গায়র মাহরাম (গম্য) পুরুষদের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করা এবং বেপর্দা হয়ে বেড়ানো থেকে।

♣ পোশাক পরিচ্ছদে অথবা চুলে মুসলিমাদর্শের পরিপন্থী কাট্‌-ছাঁট করে অমুসলিম মহিলাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা হতে।

♣ ভ্রূ চেঁছে পাতলা করা, দুই দাঁতের মাঝে (ঘষে) ফাঁক সৃষ্টি করা, নখ লম্বা করা, চেহারা দাগা বা কৃত্রিম চুল (ট্যাসেল বা ফল্‌স্‌) ব্যবহার করা হতে।

♣ সাধারণ অথবা বিশেষ অলীমা বা ভোজ-অনুষ্ঠানে অপব্যয় করা,পানাহারে অপচয় করা এবং তা ময়লার সাথে (ডাষ্ট-বিনে) ফেলা হতে।

♣ বিভিন্ন যন্ত্রের মাধ্যমে ফিল্ম্ দেখা, নারী-পুরুষের সম্মিলিত নাটক দর্শন করা অথবা গান-বাজনা শোনা হতে।

♣ নৈতিক শৈথিলতা এবং চরিত্র বিনষ্ট হওয়ার প্রতি আহ্বান করে এমন বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা পাঠ করা হতে।

♣ গায়র মাহরাম (গম্য) পুরুষ, ড্রাইভার, (রিক্সাচালক), ভৃত্য বা অন্য কারো সাথে (নারীর) নির্জনতা অবলম্বন করা হতে। বরং দাস-দাসী ও খাস ড্রাইভার ব্যবহার না করতে চেষ্টা করাই উচিত।

♣ গীবত, চুগলী,ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, মিথ্যা, অঙ্গীকার ভঙ্গ, প্রতারণা প্রভৃতি হতে।

♣ মূর্তি-খচিত অলঙ্কার বা পোষাক পরা বা (ছবি) টাঙ্গানো হতে।

♣ (দেওয়ালে) বিশেষ করে যেখানে অসার (গান-বাজনা) যন্ত্রাদি থাকে সেখানে কুরআনী আয়াত লটকানো বা টাঙ্গানো হতে।

♣ (অপ্রয়োজনে) বিশেষ করে অবৈধ কর্মে অথবা অনর্থক কাজে রাত্রি-জাগরণ হতে।

♣ মহিলার (ফিতনার ভয় থাকলে) একাকিনী সাধারণ বাজারে যাওয়া হতে।

♣ প্লেন বা অন্য কোন যানবাহনে মাহরাম (যার সহিত বিবাহ মোটেই বৈধ নয় এমন) পুরুষ ছাড়া (মহিলার একাকিনী বা অন্যের সাথে) সফর করা হতে।

♣ গায়র মাহারেম (গম্য) পুরুষদের নিকটে সুগন্ধি ব্যবহার করা হতে।

♣ গায়র মাহারেম (বেগানা) পুরুষদের সহিত মুসাফাহা করা হতে।

♣ মাথার উপরে লোটন বা খোঁপা বাঁধা এবং কৃত্রিম কেশ (পরচুলা) ব্যবহার করা হতে।

♣ অভিশাপ, গালি-মন্দ, অশ্লীল বাক্য, সন্তানদের উপর ও নিজেদের উপর বদ্দুআ করা অথবা যুগকে গালি দেওয়া হতে।

♣ চেহারার সৌন্দর্যকে অনাবৃত করে রাখে এবং পুরুষদেরকে ফিতনায় (বিঘ্নতে) ফেলে এমন বোরকা ব্যবহার করা হতে।

♣ পাতলা হওয়ার কারণে মুখমন্ডলের সৌন্দর্য সম্পূর্ণ আবৃত করে না বা খাটো হওয়ার কারণে চেহারার নিচের অংশ ঢাকে না এমন চেহারার আবরণ, ঘোমটা বা নেকাব (বোরকা) ব্যবহার করা হতে।

♣ ভ্রমণ করার উদ্দেশ্যে বহির্দেশে সফর করা এবং তাতে অর্থ অপব্যয় করা হতে।

♣ (এসব কিছু হতে দূরে থাকুন, বেঁচে থাকুন ও সাবধান থাকুন।)

অসাল্লাল্লা-হু আলা নাবিইয়্যিনা মুহাম্মাদ, অ আলা আ-লিহী অ সাহবিহী আজমাঈন।

অনুবাদক ঃ- আব্দুল হামীদ ফায়যী

১ লা রমযান ১৪১৭ হিঃ

زاد على الطريق

([illegible])

অনুবাদেঃ-

আব্দুল হামীদ আল-ফায়যী

প্রকাশনায়ঃ-

দাওয়াত ও দ্বীনী পথনির্দেশক সমবায় কার্যালয়

আল-মাজমাআহ, সউদী আরব

جمع وإعداد وترجمة وصف

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة المجمعة

زاد على الطريق

অনুবাদেঃ-
আব্দুল হামীদ আল-ফায়যী

CO-OPERATIVE OFFICE FOR CALL & FOREIGNER’S GUIDANCE AT AL-MAJMA’AH, P.O BOX 102, K.S.A
TEL- 06 4323949, FAX- 06 4311996

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة المجمعة

ص. ب. ١٠٢؛ الرمز البريدي ١١٩٥٢؛ المجمعة؛

المملكة العربية السعودية.